গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন

'বাংলা গানের ইতিবৃত্ত' লিখতে বসে আমার এ কথাটা মনে হয়েছে যে সংগীত শিক্ষা মানে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করা নয়—কেবলমাত্র সংগীতের রাগ-রাগিণী তাল ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হলেই সংগীত শিক্ষা শেষ হয় না। সংগীতের মূল উৎস কোথায় এবং সংগীতের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের কি সম্পর্ক এ বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে এই বইটি লিখতে শুরু করি।

রাগ-রাগিণীর উদ্ভব কবে থেকে শুরু হয়েছে এবং কি ভাবে তা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করেছে সে সম্পর্কে সামান্য কিছু বলবার চেষ্টা করেছি মাত্র। প্রাদেশিক সংগীত, বাংলা গানের উপর উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব, কীর্তনে শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যবহার, স্বদেশী সংগীতের উপর জাতীয় জীবনের প্রভাব, রবীন্দ্র সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। তা ছাড়া স্বরলিপি পদ্ধতি ও তালের বোল ইত্যাদিও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে তুলেছেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী ও অধ্যাপক শ্রীভোলানাথ ঘোষ। বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে যে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রীসাবিত্রী ঘোষ

উৎসর্গ

৺ব্রজেন্দ্রমোহন বসু ঠাকুর

পিতৃদেব শ্রীচরণেষু

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভারতীয় সংগীতের মূলসূত্র	...	১
চর্যাপদ	...	৩
জয়দেব	...	৮
বড়ু চণ্ডীদাস	...	১২
দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	১৪
বিদ্যাপতি	...	১৬
চৈতন্যদেব	...	২১
বৈষ্ণব পদাবলী	...	২৪
কীর্তন	...	৩০
বিভিন্ন রসের সংজ্ঞা :		
পূর্বরাগ	...	৩৩
অভিসার	...	৩৪
মান	...	৩৪
প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ	...	৩৫
মাথুর	...	৩৫
পাঁচালী	...	৩৬
শাক্ত সংগীত ও বৈষ্ণব গানের তুলনা	...	৩৭
সাধক কবি রামপ্রসাদ	...	৪০
সাধক কবি কমলাকান্ত	...	৪৩
রামনিধি গুপ্ত	...	৪৪
দাশরথি রায়	...	৪৬
গম্ভীরা	...	৪৭
ঝুমুর	...	৪৮
বাউল গান ও বাউল সাধনা	...	৪৯
কবিগান	...	৫৪

সারিগান	...	৫৬
জারিগান	...	৫৭
ভাটিয়ালী	...	৫৮
তরজা	...	৬০
আখড়াই	...	৬১
মালসী	...	৬২
মঙ্গলগীতি	...	৬৩
বাংলা গানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব	...	৬৭
কীর্তনে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর ব্যবহার	...	৭২
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সংগীত	...	৭৬
জাতীয় জীবনে স্বদেশী সংগীতের প্রভাব	..	৯২
গুরু নানক	...	৯৯
ভক্ত কবীর	...	১০২
মীরাবাঈ	...	১০৫
সন্ত তুলসীদাস	...	১১০
পরিশিষ্ট	...	১১৫
আকারমাত্রিক স্বরলিপি	...	১১৭
হিন্দুস্থানী স্বরলিপি-পদ্ধতি	...	১১৯
বিভিন্ন তালের ঠেকা	...	১২১
রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল	...	১২৩
কীর্তনে ব্যবহৃত কয়েকটি তাল	...	১২৩

ভূমিকা

বাংলা গানের একটি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বর্তমান। পুরাতন কাল থেকে অনেকগুলি বিবর্তনের স্তর বেয়ে বাংলা গান তার আধুনিক পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে।• এই পরিণতিও স্থায়ী বা অচলপ্রতিষ্ঠ নয়। কালের নিয়মেই তাতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং সেই পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করেই বাংলা গান ক্রমশঃ ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে বাংলা গানের মূল প্রায় হাজার বছরের পুরনো চর্যাপদের মৃত্তিকায় নিহিত আছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের রচিত সন্ধা অর্থাৎ হেঁয়ালির ভাষায় গ্রথিত এই পদগুলির অভীষ্ট• যদিও কোন দার্শনিক মত বা তত্ত্ব, তাহলেও দেখা যায় ওই দর্শন সংগীতের অবলম্বন বিহীন ছিল না। চর্যার অনেকগুলি পদেই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় এবং সেসব রাগ-রাগিণী ভারতীয় মার্গ-সংগীতের সমৃদ্ধ সঞ্চয় থেকে চয়িত। বেশ বুঝতে পারা যায় চর্যাগুলি একদা সুরে ও তালে গীত হতো। দোঁহার আকারে সংবদ্ধ এইসব পদের রচনায় কাব্য এবং সংগীত দুইয়েরই ভূমিকা ছিল স্বীকৃত আর সেই যুগ্ম ভূমিকার সরণী বেয়েই পরবর্তীকালে আরও সুনির্দিষ্ট ও সুগঠিত আকারে বাংলা গানের বিকাশ ঘটেছে বলে ধরে নিতে পারা যায়।

চর্যাসংগীতকে বাংলা গানের সূচনা স্বরূপ গণ্য করলে তার পরবর্তী ক্রমগুলিকে অনুসরণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কীর্তন চর্যাপদের অব্যবহিত পরবর্তীকালের যোজনা। তারও আবার দুইটি সুস্পষ্ট পর্ব: শ্রীচৈতন্য-পূর্ব ও শ্রীচৈতন্য-উত্তর। প্রাক্-চৈতন্য পর্বের কীর্তনের রূপ বিধৃত আছে সংস্কৃত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে এবং বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনাবলীতে। চৈতন্যোত্তর পর্বে কীর্তন সংগীতের তো সে এক মহাকল্লোল। পদাবলী কীর্তন, পালা কীর্তন, নগর কীর্তন আর নাম সংকীর্তনে মিলে বাংলার বুকের উপর দিয়ে একদা এক সমুদ্রপ্লাবন বয়ে গিয়েছিল বললেও চলে। সে যুগে কীর্তনের এতমত চর্চা আর এত বিভিন্ন দিকে বিস্তার হয়েছিল যে, ওই শিথিলবদ্ধ বিচিত্রপথগামী সংগীতের ধারাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে পরিচালনা করে তাকে সুসংহত অবয়ব দেবার প্রয়োজন অনুভূত

হয়েছিল। তার থেকেই ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর আহূত খেতুরীর মহোৎসবে বৈষ্ণব মহাজনদের সম্মিলিত প্রয়াসে কীর্তনের চারটি বিশেষ ঘরানার সৃষ্টি—মনোহরশাহী, গরানহাটী, রেনেটি ও মন্দারিণী। পঞ্চম একটি ঘরানারও উল্লেখ দেখা যায়—ঝাড়খণ্ডী।

প্রায় তিনশত বৎসর একটানা কীর্তন সংগীত বাংলায় একাধিপত্য করেছে। এখনও তার প্রভাব একেবারে মিইয়ে যায়নি। যদিও পূর্বের তুলনায় কীর্তনের সে গৌরব আর নেই, তবুও সংগীত সমালোচকগণ এ বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত যে, কীর্তনই হলো বাংলার জাতীয় সংগীত। বাঙালীর একান্ত নিজস্ব স্বকীয় প্রতিভা থেকে এই সংগীতের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি। ভারতবর্ষের আর অন্য কোন প্রান্তে কীর্তনের অনুরূপ গানের সাক্ষাৎ মেলে না। এর ভক্তির দিকটিকে বাদ দিয়েও এর সুরের একটি বিশিষ্ট আবেদন রয়েছে। সে আবেদনের মূলে আছে তার সুরৈশ্বর্য, গায়নশৈলীর অপূর্ব ভঙ্গিমা, ছন্দোবৈচিত্র্য, সর্বোপরি 'আখর' নামক এক বিশেষ বাণীগত অলংকারের আকর্ষণ। কীর্তন গানের অনুশীলনের এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে হয়।

কীর্তনের সমসাময়িক কালেই প্রায় শাক্ত সংগীতের উৎপত্তি। বৈষ্ণব সাধনার শ্রেষ্ঠ সাংগীতিক রূপ যদি হয় কীর্তন, তাহলে শক্তিসাধনার শ্রেষ্ঠ সুরের অভিব্যক্তি ঘটেছে তার শাক্ত সংগীতগুলিতে। নামের মধ্যেই শক্তিভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। মাতৃসংগীত, কালী সংগীত, চণ্ডীগীতি, সাধন সংগীত, মালসী গান, আগমনী, বিজয়া প্রভৃতি এই সংগীতের কয়েকটি সুপরিচিত রূপ। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন এই ধারার গানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। তার পরেই নাম করতে হয় সাধক কবি কমলাকান্তের। শাক্ত সংগীতের সুর সরল কিন্তু ভাব অতিশয় গভীর।

তার পরেই বাংলা গান অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। বিস্তারিত আলোচনার অবসর নেই, শুধু বিবর্তনের পথের মোটা দিক্‌চিহ্নগুলির উপর একনজর চোখ বুলিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাত্র। বাংলা গানের অনুষঙ্গে এইরকম কিছু উল্লেখযোগ্য দিক্‌চিহ্ন হলো—রামায়ণ গান, ঢপ-কীর্তন, পাঁচালী, নিধুবাবুর টপ্পা, কবিগান, তরজা, বাউল, আখড়াই ও হাফ-আখড়াই, মঙ্গলগীতি, কথকতার গান, রাগাশ্রয়ী পুরাতন বাংলা গান, থিয়েটারের গান, এবং সর্বশেষে আধুনিক যুগের গান। আধুনিক যুগের গানের কয়েকজন সর্বস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি রজনীকান্ত,

অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম। এই পাঁচজনাই একাধারে গীতিকার ও সুরকার। এঁদের সৃষ্ট গীত ও সুরের মধ্য দিয়ে বাংলা গান তার একালীন বিশিষ্ট রূপটি লাভ করেছে। সে রূপ বাণী ও সুর দুই দিক থেকেই অত্যন্ত

উপরে বাংলা গানের যেসব শ্রেণীরূপের উল্লেখ করা হলো তার পাশাপাশি বাংলা গানের আর একটি সমান্তরাল ধারা বয়ে চলেছে—লোক সংগীতের ধারা। লোকসংগীত জনজীবনের হৃদয় থেকে উত্থিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত তার প্রকাশ। এ গানে নাগরিক সংস্কৃতির বৈদগ্ধ্য কিংবা রুচির সূক্ষ্মতা অনুপস্থিত কিন্তু তার জায়গায় ক্ষতিপূরণ স্বরূপে পাওয়া যায় বাংলার গ্রামজীবনের মানুষের সুখ-দুঃখ মথিত সহজ প্রাণের অভিব্যক্তি ও অকপট আন্তরিকতা। বিদ্যাভ্যাস বর্জিত অথবা সামান্য আক্ষরিক জ্ঞানের নির্ভরে রচিত তথাকথিত 'অশিক্ষিত পটুত্বের' দ্বারা চিহ্নিত এই শ্রেণীর গানের কথায় ও সুরে একটুক্ষণ কান পাতলেই বাংলার লোকহৃদয়ের ধুকপুকুনি শুনতে পাওয়া যাবে।

বাংলার লোকসংগীতের সর্বাধিক পরিচিত রূপ হলো—বাউল, ভাটিয়ালি, জারি গান, সারি গান, ভাওয়াইয়া, চটকা, গম্ভীরা, করম, টুসু, ঝুমুর, আলকাপ, ভাদু, রায়বেঁশে, ঘাঁটু প্রভৃতি।

লোকসংগীত ও নাগরিক সংগীতের বাইরে বাংলা গানের আরও একটি প্রসিদ্ধ বিভাগ আছে—স্বদেশী সংগীত। বাংলার জাতীয় চেতনার উদ্বোধনায় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে এই সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী চৌধুরাণী, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, চারণকবি মুকুন্দ দাস প্রমুখ এই ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে গেছেন তার তুলনা হয় না। স্বদেশী সংগীত বাংলা গানের এক মূল্যবান সম্পদ।)

উপরে বাংলা গানের বিবর্তনের ইতিহাসের যে-ছকটি তুলে ধরা হলো, শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষ-রচিত 'বাংলা গানের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থখানার তা-ই হলো উপজীব্য। বস্তুতঃ, আমি শ্রীযুক্তা ঘোষের বইয়ের রেখা-চিহ্ন অনুসরণ করেই বাংলা গানের উক্তরূপ পরিচয়িকা সংকলন করে দিলুম। এ জাতীয় একখানি গ্রন্থ রচনায় শ্রীযুক্তা ঘোষের যোগ্যতা সংশয়াতীত। তিনি নিজে একজন সুগায়িকা। প্রখ্যাত সংগীতগুরু ৺গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺গিরিজাশঙ্কর

চক্রবর্তী এবং শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী মহাশয়গণের কাছে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন। এ ছাড়া লোকান্তরিত সংগীতজ্ঞ প্রসিদ্ধ সুরকার হিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর মহাশয়ের কাছেও তিনি শিক্ষালাভ করেন। এই শিল্পীর একাধিক গান গ্রামোফোন রেকর্ড ও রেডিওতে গীত হয়ে শ্রোতৃসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। তদুপরি তিনি সাহিত্যের একজন অনুসন্ধিৎসু রূপে বাংলা গানের ধারাবাহিক ইতিহাসের বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। এই বইখানিই তাঁর সেই জ্ঞানের সম্যক্ প্রমাণ বহন করছে।

বইয়ের ভাষা সরল, সুবোধ্য, প্রাঞ্জল। অযথা পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শনীর দ্বারা বক্তব্য বিষয়কে জটিলতা ভারাক্রান্ত করার আদৌ কোন চেষ্টা নেই বইটিতে। যাঁদের জন্য এই বই উদ্দিষ্ট অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের সাধারণ পাঠক এবং বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, তাঁদের এই বই খুবই কাজে লাগবে। সংগীতের ইতিহাস ছাড়াও এই বই থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও অনেকখানি সংগ্রহ করা যাবে।

মোটকথা, বইখানা সুলিখিত। বাংলার পাঠক সমাজে বইখানার উপযুক্ত সমাদর হোক, এই কামনা করি।

নারায়ণ চৌধুরী

ভারতীয় সংগীতের মূলসূত্র

সংগীত মানে কেবল মাত্র কণ্ঠসংগীত নয়— পণ্ডিতগণের মতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বয়েই সংগীত। এর আভাস রামায়ণেও পাওয়া গেছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও সংগীত বলতে গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনকেই বুঝিয়েছে (তৌর্যত্রিক)।

এখন দেখতে হবে ভারতীয় সংগীতের মূলসূত্র কোথায় এবং সেই মূলসূত্রের সন্ধান করতে গেলে জানতে হবে সংগীত চর্চার নিদর্শন আমরা কবে থেকে পাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, প্রাক্‌বৈদিক যুগ থেকেই সংগীত-চর্চার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা পাই। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে— যেমন মহেনজোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংস স্তূপ থেকে—নিদর্শনগুলি মেলে। তবে এরও পূর্বে সংগীতের সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। কারণ প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল খুব উন্নত ধরনের। আর এ কথা সত্যি যে, কোনও কলা বিদ্যার পরিপূর্ণ রূপ ধারণ কেবলমাত্র এক যুগে সম্ভব হয় না— তার প্রস্তুতি শুরু হয় বহুপূর্ব থেকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সংগীতের নিদর্শন পাওয়া যায় সে বিষয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন— "… একটি বাঁশী পাওয়া গেছে— যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে স্বরের বিকাশ তখন হয়েছে ও প্রাগৈতিহাসিক গানে স্বরের ব্যবহার হত। তন্ত্রীযুক্ত কয়েকটি বীণা (যে বীণার আকার বা অবয়ব অনেকটা আজকালকার রবাব বা সরোদের মতো দেখতে), মৃদঙ্গাদি চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, খঞ্জনী বা করতাল, একটি ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীর ও একটি নৃত্যরত নর্তকের ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে।" (সংগীত ও সংস্কৃতি)

এ উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে সংগীতের ইঙ্গিত পাই। তবে বৈদিক যুগে সংগীতের একটা সুষ্ঠু রূপের পরিচয় মেলে। বৈদিক সাহিত্যের মধ্য থেকে আমরা তখনকার যুগের সংগীতচর্চার নিদর্শন পেয়ে থাকি। তখন গান ছিল সামগান। তবে সামগানে রাগের ব্যবহার ছিল কি না এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। আর অধিকাংশ পণ্ডিত সে যুগের গানে রাগের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। কিন্তু সে যুগে চার থেকে সাত স্বরের প্রয়োগ

ছিল— গানের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী ছিল, ছন্দ, গতি ও রসের বিকাশ ছিল—এ কথা আমরা জানতে পারি বৈদিক সাহিত্যগুলি থেকে। সামগানে চার থেকে সাত স্বরের প্রয়োগ ছিল। সেই সাত স্বরের নাম যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, আতিসর্য ও ক্রুষ্ট এবং এদের বলা হত বৈদিক স্বর। বৈদিক যুগে 'রাগ' শব্দটির উল্লেখ না থাকলেও সামগান বিভিন্ন স্বর সমাবেশে মধুর ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল একথা ইতিহাস থেকে জানা যায়।

ক্ল্যাসিকাল যুগে লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বরের প্রচলন ছিল। অনেকের মতে বৈদিক সাত স্বরের পাশাপাশি লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বরেরও বিকাশ ছিল। আবার ক্ল্যাসিকাল যুগে যে গন্ধর্ব গানের প্রচলন হয় তাতে লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বরের ব্যবহার ছিল।

এ ছাড়া মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত ও খিল হরিবংশে সংগীতের নিদর্শন মেলে। বাল্মীকির রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, রামের দুই পুত্র লব ও কুশ প্রথম রামায়ণ গান প্রচার করেন। পুত্রদ্বয় বিভিন্ন উৎসবে ও যজ্ঞানুষ্ঠানে রামায়ণ গানের বিশেষ রূপ দান করেন রাগ, তান ও তাল সমন্বয়ে। কাজেই এ থেকে এ কথা অনুমেয় যে রাগের ব্যবহার রামায়ণ যুগে ছিল।

এর পর মুনি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি পূর্বসূরীদের রচনাশৈলীকে অন্তরে গ্রহণ করে নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। ভরতের সময় সামগানের প্রচলন সামগদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাই তিনি নাট্যশাস্ত্রে মার্গ ও দেশী উভয় গানেরই পরিচয় দিয়েছেন। ভরত ১৮টি জাতি রাগ গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে ৭টি শুদ্ধ ও ১১টি বিকৃত। রামায়ণ যুগে শুদ্ধ জাতি গানে কোমল স্বরের ব্যবহার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধ জাতি গানে দুটি মাত্র কোমল তথা বিকৃত স্বরের ব্যবহার ছিল বলে অনেকে মনে করেন। মোট কথা, নাট্যশাস্ত্রের যুগে ভারতীয় সংগীত পূর্বের চেয়ে আরও সুনিয়ন্ত্রিত ও অলংকারযুক্ত হয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রে ষড়জাদি সাত স্বর ছাড়া বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বরেরও উল্লেখ আছে।

প্রাচীন কালের পর মধ্যযুগের আবির্ভাব। মধ্যযুগের রচনাদির ভিতর শার্ঙ্গদেবের (ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) 'সংগীত রত্নাকর' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং এ গ্রন্থ থেকে আমরা তৎকালীন সংগীতের বিষয় জানতে পারি। এই গ্রন্থে তিনি অভিজাত দেশী সংগীতের পরিচয় দিয়েছেন। এই

গ্রন্থের প্রবন্ধ অধ্যায়ে গন্ধর্ব ও গান এই দুটি বিভাগে ভারতীয় সংগীত শ্রেণীকে বিভক্ত করা হয়েছে। গন্ধর্ব হল মার্গ সংগীত এবং গান বলতে অভিজাত দেশী সংগীতকে বোঝায়।

মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় ঐ যুগে শার্ঙ্গদেব ছাড়াও পণ্ডিত অহোবল, শ্রীনিবাস ও কবি লোচনের আবির্ভাব হয়। পণ্ডিত অহোবলই সর্বপ্রথম বীণার তারের উপর ১২টি স্বরের স্থাপনা করেন। অহোবলের পর শ্রীনিবাস বীণার তারের উপর ১২টি স্বরের স্থান নির্দিষ্ট করেন।

আধুনিক কালে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে সাত শুদ্ধ ও পাঁচ বিকৃত মোট ১২টি স্বরের স্থাপনা করেন। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের স্বরগুলির পার্থক্য শ্রীনিবাসের ও ভাতখণ্ডের স্বরগুলির স্থানের পার্থক্যের অনুরূপ। এই দুই কালের স্বরগুলির তুলনা করতে গেলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগে শুদ্ধ গ ও ন আধুনিক কালে যথাক্রমে কোমল গ ও কোমল ন হয়। মধ্যযুগের পণ্ডিত বলতে যেমন অহোবল ও শ্রীনিবাসকে বোঝায়, তেমনই আধুনিক যুগের পণ্ডিত বলতে ভাতখণ্ডেজীকে বোঝায়। তবে উভয় যুগের পণ্ডিতেরা স্বরের আন্দোলন সংখ্যা ও দৈর্ঘ্যের বিষয়ে একমত ছিলেন। কেবল মাত্র পার্থক্য দেখা যায় কোমল র, কোমল ধ ও তীব্র মধ্যম সম্পর্কে। বর্তমানের কোমল গ ও কোমল ন ছিল মধ্যযুগের শুদ্ধ গ ও শুদ্ধ ন, অর্থাৎ মধ্যযুগের তীব্র গ ও তীব্র ন বর্তমান প্রচলিত শুদ্ধ গ ও শুদ্ধ ন এর সমান। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী শুদ্ধ ম ও প এর মাঝখানে তীব্র মধ্যমের স্থান নির্ণয় করেছেন এবং ভাতখণ্ডেজীর এই মতই এখন প্রচলিত। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিন যুগের পণ্ডিতগণই এক সপ্তকে ২২টি শ্রুতি মেনে নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এ কথা বলা যেতে পারে যে, পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী যে মতকে স্থাপনা করেছেন বর্তমানে সে মতই প্রচলিত।

চর্যাপদ

সংগীতে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার চর্যা যুগ থেকে শুরু হয়েছে বলে আলঙ্কারিকদের মত। তবে প্রাক্‌বৈদিক যুগেই সংগীতচর্চার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা পাই ঐতিহাসিক তথ্য থেকে। পণ্ডিতগণের অনুমান তারও অনেক পূর্বে

সংগীতের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে বৈদিক যুগে সংগীতের একটা সুষ্ঠু রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন গান ছিল সামগান, আর তাতে রাগের ব্যবহার ছিল কিনা এ নিয়ে অনেক বাদ-বিসংবাদ হয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিতেরা সে যুগের গানে রাগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তবে চর্যাপদে যে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে কতকগুলি রাগ মার্গ সংগীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

চর্যাপদগুলির কিছুটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ১৯০৭ সালে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে গিয়ে পুরাতন বাংলা ভাষায় রচিত 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামক একখানি পদসংগ্রহ আবিষ্কার করেন। চর্যাপদগুলি এই পদ-সংগ্রহ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। ঐ পদগুলি বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত সাধনার দিক্ ও দ্বিতীয়ত দার্শনিক তত্ত্বের দিক্। তবে দার্শনিক তত্ত্বটি এর প্রধান দিক্ নয়— প্রধান হল সাধনার দিক্, কারণ চর্যাপদের কবিগণ ছিলেন মুখ্যত একটা বিশেষ যোগপন্থার সাধক। পদগুলির মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ মতবাদ দুইই সমন্বিত হয়েছে। চর্যার সাধকরা পদরচনায় নানা রূপকের সাহায্য নিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন রূপে চর্যাপদের নাম উল্লেখ করা হয়। কুড়ি জন সিদ্ধাচার্যের রচনা সম্বলিত এই গ্রন্থ। চর্যার অর্থ আচরণ— গূঢ় রূপকের সাহায্যে ধর্মতত্ত্ব ও সাধন তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে এই চর্যাপদে। চর্যাপদগুলি বিশ্লেষণ করলেই এর অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা যায়। এখানে একটি পদের উল্লেখ করা হল—

রাগ—পটমঞ্জরী

'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল।' (১নং পদ)

উপরিউক্ত পদটিতে মানুষের দেহের সঙ্গে বৃক্ষের তুলনা করা হয়েছে— বৃক্ষের পাঁচটি শাখাকে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই পদটিতে লুইপাদ বলেছেন যে বিষয়ের আকর্ষণে চিত্ত চঞ্চল হয় বলেই আমরা দুঃখ ভোগ করে কাল কবলিত হই। চর্যাপদের প্রায় সকল পদের মধ্যেই শূন্যবাদ বিদ্যমান। যেমন—

—'দিঢ় করিও মহাসুখ পরিমাণ' অর্থাৎ মহাসুখ লাভ করাই জীবনের সাধনার চরম লক্ষ্য। হিন্দুতন্ত্রের আসন, মুদ্রা ও সাধন প্রাণায়াম দ্বারা ষট্‌চক্র

ভেদ করে সহস্রার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে পরমশিবের মিলনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পদটিতে রাগের উল্লেখ আছে, বস্তুত চর্যাপদের প্রত্যেকটি পদেই একটি করে রাগের উল্লেখ আছে। চর্যাপদে ব্যবহৃত কয়েকটি রাগের নাম এখানে উল্লেখ করা হল, যেমন— পটমঞ্জরী, গুর্জরী, কামোদ, দেশাখ, বলাড্ডি, ভৈরবী ইত্যাদি ও অন্যান্য আরও বহু রাগ। পটমঞ্জরী, বরাড়ী, মল্লার, মালশ্রী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীগুলি বৈষ্ণব পদাবলীতে সুপরিচিত। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বৌদ্ধ চর্যাপদগুলি বাংলা কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন। শাস্ত্রী মহাশয় এ কথাও লিখেছিলেন— "গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত, গানের নাম চর্যাপদ। সেকালেও সংকীর্তন ছিল এবং কীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ বলিত।" শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি থেকে এ কথা অনুমেয় যে, চর্যাযুগ থেকেই কীর্তনের শুরু হয়েছে। চর্যাপদে ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বসাধনার দিক্ ছাড়াও সংগীতের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটা কথা এখানে উল্লেখ্য যে, চর্যাপদে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীগুলি মার্গ সংগীতেও ব্যবহৃত। রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থাকাতে এটুকু বোঝা যায় যে, চর্যাপদগুলি সবই গেয় ছিল। এখানে ১০নং পদটি উল্লেখ করা হল—

রাগ— দেশাখ

'এক সো পাদুমা চৌষঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।'

এই পদেও রাগের উল্লেখ রয়েছে। এই পদটি কাহ্নুপাদের। এই পদে পরমশিবের সঙ্গে পরমশক্তির সহস্রাদল পদ্মের মিলনের ইঙ্গিত করা হয়েছে। মোহ ত্যাগ করে চিত্তের মুক্তি বিধান করতে হয়— এই হচ্ছে হিন্দুদর্শনের কথা। চর্যাপদে মোহতরুকে বিনষ্ট করবার নানারূপ বর্ণনা আছে। যেমন,—

রাগ— গুর্জরী

'ফাড়িও মোহতরু পাটি জোড়িও।'

এই পদটিতে রাগ গুর্জরীর উল্লেখ রয়েছে। মোহমুক্তির জন্য কায়া সাধনার দ্বারা চিত্তধর্ম নষ্ট করবার কথা বহু কবিতায় রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। চর্যাপদের সাধকেরা ভারতীয় দর্শনের অন্যতম মূল তত্ত্ব অনুযায়ী নির্বাণের অবস্থাকে মহাসুখ বলেছেন। সেই সুখের সন্ধানেই জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা। ১৩নং পদ—

রাগ—কামোদ

'ত্রিশরণ ণাবী কিন্তু অঠক মারী।
নিঅ দেহ— করুণা শূণমে হেরী।'

এই পদটিতে রাগ কামোদের উল্লেখ আছে। পদের মর্মার্থ—কায়-বাক্-চিত্ত চতুর্থ শরণে লীন হয়েছে এবং আট প্রকার বুদ্ধৈশ্বর্য অনুভূত হচ্ছে। পদকর্তা পদটির মধ্যে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করে তাতে রাগ সংযোজিত করেছেন। এ জাতীয় সব পদই গেয়। পরবর্তী যুগের সংগীতেও এই সমস্ত রাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর ১৬নং পদ—

রাগ— ভৈরবী

'তিনি এ পাটে লা গেলি রে অণহ্ কসণ ঘণ গাজই
তা সুনি মরে ভয়ঙ্কর রে বিসঅ-মণ্ডল-সঅল ভাজই।'

পদটির মধ্যে ভৈরবী রাগের উল্লেখ রয়েছে। পদটির ব্যাখ্যা— এই চিত্তরূপ বৃক্ষকে ছেদন করে কায়বাক্‌মনোরূপ তিনটি পাট প্রস্তুত করা হয়েছে। তারপর তারা জ্ঞানমদিরা দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে একীভূত হয়ে যুক্ত হয়েছে। এ থেকে এ কথা অনুমেয় যে, চর্যাপদকর্তারা কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনার কথা বলেই চুপ করে থাকেননি— প্রত্যেকটি পদই কোন না কোন রাগের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন। চর্যাযুগে যে মার্গ সংগীতের প্রচলন ছিল তা বুঝতে পারা যায় এ সমস্ত পদ বিশ্লেষণ করলে। বর্তমান যুগেও ভৈরবী রাগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরপর ২৮নং পদ—

রাগ— বলাড্ডি

'উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসব সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥'

এই পদে শবরপাদ বলছেন যে, যোগীন্দ্রের সমুন্নত কায় কঙ্কাল রূপ সুমেরু শিখরে অর্থাৎ মহাসুখ চক্রে বজ্রধর শবরের সহজ গৃহিণী নৈরাত্মা দেবী বাস করেন। তিনি নানাবিধ বিকল্প রূপ ময়ূর পুচ্ছ দ্বারা বাইরে নিজের স্বরূপ অলঙ্কৃত করে রেখেছেন আর কণ্ঠে গুহ্য মন্ত্ররূপ গুঞ্জামালা ধারণ করেছেন। এখানে দেহকে সুমেরু পর্বতের সঙ্গে, মস্তককে শিখরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব পদেই শূন্যবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে কোনও কোনও সাধক কেবলমাত্র তত্ত্বদর্শনটি প্রকাশ করেছেন, আবার কোনও কোনও আচার্য

মহাসুখ তত্ত্ব ও শূন্যবাদের কথা প্রকাশ করেছেন। কম্বলাম্বর পাদের পদে আছে—

'সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥'

পদকর্তা এখানে বলছেন— 'আমার করুণা গঠিত নৌকা সর্ব শূন্যতায় পরিপূর্ণ, কাজেই সেখানে রূপা অর্থাৎ রূপ বেদনাদি পঞ্চস্কন্দ গঠিত বস্তুজগতের স্থান নেই। এই রূপে চর্যাপদের পদকর্তারা তাঁদের পদের মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিক বাদ ও শূন্যবাদ ছাড়া আর একটি বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হল পদগুলি সবই রচিত হয়েছে রাগ-রাগিণী আশ্রয় করে। চর্যাপদ থেকে সংগীতের ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট পাওয়া যায়। পদের মধ্যে রাগ ছাড়া ছন্দের ব্যবহারও খুব সুন্দর রয়েছে— এতে ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং চর্যাপদকাররা প্রধানত পাদাকুলক চান্দ্ররী বা পদঝটিকা ব্যবহার করেছেন। চর্যাপদ বাংলার ভক্তি-গীতির প্রাচীন নিদর্শন। ধীরে ধীরে এই গীতি ধারা পরবর্তী যুগে পদাবলীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। চর্যাপদগুলি জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত হয়েছিল, কাজেই আলঙ্কারিকরা মনে করেন যে, প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে এবং বাংলার সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট বলে চর্যাপদেই বাংলা ছন্দের আদি রূপের সন্ধান মেলে। চর্যার ছন্দের অনুকরণ গীতগোবিন্দেও পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন জয়দেবের পদ—

'ধীর সমীরে | যমুনা তীরে | বসতি বনে বন | মালী'

সেইরূপ চর্যাপদ—

'উঁচা উঁচা | পাবত তহিঁ | বসঈ সবরী | বালী'

বাংলা পয়ার ও ত্রিপদীর প্রাচীনতম রূপের সন্ধান এই সব চর্যাপদে পাওয়া যায়। ৺মণীন্দ্রমোহন বসু লিখে গেছেন যে, চর্যাপদগুলি সন্ধাভাষায় লিখিত হয়েছে, এইজন্য টিকা ছাড়া সহজে এর মর্ম গ্রহণ করতে পারা যায় না। সব দিক্ দিয়েই চর্যাপদ ব্যংলার প্রাচীনতম নিদর্শন। এ থেকে আমরা এ কথা জানতে পারি যে, কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনার দিক্ই চর্যাপদে প্রকাশ পায়নি, সেই সঙ্গে এ কথা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সব চর্যাপদই গেয় ছিল এবং রাগ-রাগিণীর প্রচলন ছিল আর তার সঙ্গে ছন্দের ব্যবহারও করা হয়েছিল। ভক্তিগীতির প্রাচীন নিদর্শন এই চর্যাপদ। এরপর এই প্রভাব গীত-গোবিন্দে বিস্তৃত হয়েছে এবং পরবর্তী যুগের অন্যান্য কবিদের উপরও পড়েছে।

চর্যাপদের মধ্যে মার্গ সংগীতের রাগ-রাগিণীর উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই আলঙ্কারিকরা চর্যার ভাব রস ও তত্ত্ব আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, চর্যাপদগুলি বাংলা কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বাংলাদেশে এক বিরাট পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে যে এর আগেও এই জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, চর্যাপদগুলি তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কীর্তন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির উৎসও চর্যাপদ।

জয়দেব

জয়দেবের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে নানা লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। তবে তার উপর ভিত্তি করে কোনও বিস্তারিত পরিচয় গঠন করা যায় না। জয়দেব লক্ষণ সেনের 'পঞ্চরত্নের' অন্যতম ছিলেন, তা আলঙ্কারিকরা বলে গেছেন। কথিত আছে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী আর পত্নীর নাম পদ্মাবতী। বাংলায় প্রচলিত অন্যান্য জীবনী মতে পদ্মাবতী পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী ছিলেন। জয়দেবের অতি জনপ্রিয়তার ফলে শুধু বাংলার একাধিক গ্রাম নয়, উড়িষ্যা ও মিথিলাবাসীরাও কবিকে তাঁদের দেশের কবি বলে দাবী করেছেন। অবশ্য নানারূপ প্রমাণ ও তথ্য দৃষ্টে জয়দেবকে বীরভূমের কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামের অধিবাসী বলে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই গ্রামে প্রতি বৎসর জয়দেবের মেলা হয়।

জয়দেবের কথা বলতে গেলেই 'শ্রীগীতগোবিন্দম্'-এর কথা স্মরণ করতে হয়। আজ সারা ভারতে এই গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে সমাদৃত। রাধা-কৃষ্ণের মিলন-লীলা কাব্যের বিষয়বস্তু। রচনাকৌশল ও ভক্তিরসের জন্য এই গ্রন্থ সারা ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করেছে। এটি একটি সংগীতময় কাব্য এবং পদগুলি গেয়। এর মধ্যে যে রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে, তা সত্যিই অভিনব।

গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ 'জন্মখণ্ডের' ১৫শ অধ্যায়ের প্রথম আটটি শ্লোকের প্রায় হুবহু মিল আছে। কাজেই

জয়দেবের কাহিনীর সূত্রটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন উঠেছে অন্যান্য পুরাণে 'রাধার' উল্লেখ নেই অথচ জয়দেব 'রাধা' নামটি কোথায় পেলেন? জয়দেবের পূর্বে কবি হাল সংকলিত 'গাথাসপ্তশতী'তে শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও যশোদার বর্ণনা আছে। কবীন্দ্র-বচন সমুচ্চয় ও সদুক্তিকর্ণামৃতের অনেকগুলি শ্লোকে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণিত হয়েছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে জয়দেবের ৩১টি পদ সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে ২৬টি পদই 'গীতগোবিন্দম্' বহির্ভূত অন্য ধরনের রচনা। এই পদগুলির বেশীর ভাগই যুদ্ধ, বীররস ও লক্ষণ সেনের স্তুতি।

গীতগোবিন্দের সঙ্গে বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উত্তর-চৈতন্যযুগের কবি-গোষ্ঠীর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য জয়দেবের পদাবলীর খ্যাতি বাঙ্গালীর মধ্যে কালজয়ী হয়েছে। কথিত আছে, চৈতন্যদেব 'গীতগোবিন্দম্'-এর পদের রস আস্বাদন করতেন। এ থেকে এ কথা অনুমেয় যে, গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তুর মধ্যে ভক্তিরসের ধারা বিশেষ ভাবে বহমান ছিল। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিপর্বে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

'বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥'···

সহজিয়া মতের বৈষ্ণবগণ জয়দেবকে 'নবরসিকের' অন্যতম আদিগুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী যুগের কবিরা এঁকেই অনুসরণ করে পদ রচনা করে গেছেন এবং গীতগোবিন্দের ছন্দ, ভাষা ও অলঙ্কার ইত্যাদিকে আয়ত্ত করে তাঁদের পদাবলীতে পরিবেশন করেছেন।

গীতগোবিন্দের ভাষা বিচার করে আলঙ্কারিকরা এর মধ্যে ভাষা, ছন্দ ও অন্ত্যানুপ্রাস অপভ্রংশের প্রভাব উপলব্ধি করেছেন। অনেকে মনে করেন গীতগোবিন্দের পদ অপভ্রংশ বা প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল, পরে সেগুলিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু গীতগোবিন্দের ভাষায় সংস্কৃতের প্রাবল্যই লক্ষ্য করা যায়, যেমন—

'স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনানলো
হরতু তদু পাহিত বিকারম্॥'···

গীতগোবিন্দের ছন্দের মধ্যে একটা ঝঙ্কার আছে। তাঁর পয়ার, ত্রিপদী

ছন্দে রচিত নানাশ্লোকের মধ্যে এখানে একটি ত্রিপদী ছন্দে রচিত শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করছি। বলা বাহুল্য জয়দেবের পদাবলী মুখ্যত মাত্রাবৃত্তে রচিত। ত্রিপদীর উদাহরণ—

'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥'

জয়দেবের এই পদটি কেবল যে ত্রিপদী ছন্দে রচিত তাই নয়— অনুপ্রাস ও ধ্বনির চূর্ণঝঙ্কারে পদটি এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে। পদটিতে জয়দেবের উৎকণ্ঠিতা নায়িকার রূপ সুন্দর ফুটে উঠেছে। জয়দেবের রাধা এখানে উৎকণ্ঠিতা নায়িকা— তিনি বৃক্ষপত্র পতনের অথবা বিহগের পক্ষ সঞ্চালনের শব্দ শুনে ভাবছেন এই বুঝি তাঁর দয়িত এসে উপস্থিত হবেন। ছন্দ, ভাব, অনুপ্রাস ও ধ্বনি প্রাচুর্যে পদটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

জয়দেবের 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' পরবর্তী যুগের অন্যান্য কবিদের কি রকম প্রভাবিত করেছে, তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে জয়দেবের পদ ও বিদ্যাপতির পদ দেওয়া হল—

জয়দেব— 'মুহু রব কোকিত মণ্ডন লীলা
মধুরিপুরহমিতি ভাবন শীলা ॥'…

বিদ্যাপতি— 'হাথক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥'…

জয়দেবের ছন্দের প্রভাব গোবিন্দদাসের পদেও পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

জয়দেবের পদ— 'রজনি জনিত গুরু | জাগব রাগক
মায়িতমলসনিমেষম্'…।

গোবিন্দদাসের পদ— 'নীরদ নয়নে | নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব'…।

জয়দেবের ঝল্লনা ছন্দে রচিত পদ—

'স্মর গরল খণ্ডনং | মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লব মুদারম্'… ইত্যাদি।

শশিশেখরের পদ— 'তুঙ্গমণি মন্দিরে | ঘন বিজুরি সঞ্চরে
মেঘরুচিবসন পরিধানা'।…

এই রূপে বড়ু চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে পরবর্তী কবিদের বেশীর ভাগ পদেই জয়দেবের ছন্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক যুগে কবি রবীন্দ্রনাথও জয়দেবের ছন্দের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। তিনি পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন—

১) 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে | করেছো এ কি | সন্ন্যাসী
বিশ্বময় | দিয়েছো তারে | ছড়ায়ে'·

২) 'বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী
হরতিদর | তিমিরমতি | ঘোরম | ···

এই রূপে পরবর্তী কবিগণ জয়দেবের ছন্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

জয়দেব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন— 'তিনি নিশ্চয়ই একজন উচ্চাঙ্গের কবি, তাঁহার শব্দচয়ন ও শব্দযোজনার সামর্থ্য অসাধারণ, শব্দগুলি যেন বীণার ঝঙ্কারের মত সুরের লহর তুলিয়া শ্রবণ পথে ভাসিয়া যায়। শব্দ যোজনার প্রভাবে তিনি যে এক একটা ভাবের আলেখ্য মানস পটে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি উজ্জ্বল, অতি সুন্দর, অতি মনোহর।' বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের গীত-গোবিন্দের কাব্যমূল্য স্বীকার করে নিলেও তিনি গীতগোবিন্দে বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে অপ্রাকৃত লীলা বলে স্বীকার করেননি। আবার রবীন্দ্রনাথও একটি প্রবন্ধে জয়দেব ও কালিদাসের রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— 'জয়দেব সঙ্গীত ঝঙ্কারে কালিদাসকে অতিক্রম করলেও কালিদাস ব্যঞ্জনাধর্মিত্বে জয়দেবকে অতিক্রম করেছেন।'

'গীতগোবিন্দ' কেবল সংগীতময় কাব্য বললে ভুল হবে—এতে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। জয়দেবের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কিছুটা সম্পর্ক ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন, কারণ দক্ষিণ ভারতের গায়ন পদ্ধতির সঙ্গে গীতগোবিন্দের মিল দেখতে পাওয়া যায়। তবে জয়দেবই দক্ষিণভারতীয় সংগীতকে অনুসরণ করেছেন, না, দক্ষিণভারতীয় সংগীতকাররা জয়দেবকে অনুসরণ করেছেন সে বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়নি।

জয়দেবের কাব্যে মালব, গুর্জরী, যতি প্রভৃতি তালের উল্লেখ আছে। 'গীতগোবিন্দ' শুধু মাত্র বাংলাদেশেই সমাদর পায়নি— এ কাব্যের খ্যাতি দক্ষিণ ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে বাংলাদেশ 'গীতগোবিন্দ' থেকে পেল এক নতুন ধারা— পরবর্তী যুগের সংগীত ধারা এই গীতগোবিন্দের রাগ, তাল ও গায়ন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও

এই রাগ ও তালের উল্লেখ রয়েছে। সব দিক্ দিয়ে বিচার করলে 'গীতগোবিন্দ' সার্থক সৃষ্টি, যা পরবর্তী কালের সাহিত্য ও সংগীতকে নানা সম্ভারে সজ্জিত করে সংগীত ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে।

এখানে এ কথা স্বীকার্য যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দকে বাদ দিয়ে কি প্রাচীন, কি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোনও আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। ছন্দে, ভাবে ও শব্দের চূর্ণঝঙ্কারে 'গীতগোবিন্দ' এক বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর কাব্য এবং রাধা-কৃষ্ণ লীলা অবলম্বনে কাব্য রচনার প্রধান গৌরব জয়দেবেরই প্রাপ্য। পদাবলীর প্রবর্তকও যে জয়দেব এ কথা বলেছেন আলঙ্কারিকরা। কবি জয়দেবকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

'যেথা জয়দেব কবি কোন্ বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বরে ॥'…

সর্বশেষ এই কথা বলা যেতে পারে 'গীতগোবিন্দ' ভাষা, ভাব, ছন্দ, রাগ ও তাল সমন্বিত এক অভিনব সৃষ্টি, যা যুগ যুগ ধরে জনসাধারণের মনে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

বড়ু চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস নিয়ে যে সমস্যা তার আজও সমাধান হয়নি। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কৃত হবার পর বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা মনে করেছিলেন যে সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু তা আজও সম্ভব হয়নি। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নিয়েও মতবিরোধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন বীরভূমের নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম, আবার কারও কারও মতে বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম। ছাতনা গ্রামেও চণ্ডীদাসের ভিটা ও বাসলীর মন্দির আছে বলে প্রবাদ বর্তমান। এ ছাড়াও অনেক গালগল্প প্রচলিত আছে চণ্ডীদাস সম্পর্কে। তবে ইনি যে চৈতন্য-পূর্ববর্তী তা বোঝা যায় কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি থেকে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের কাব্যের রস আস্বাদন করতেন। এখন প্রশ্ন এই: শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কিনা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে

৪১৫টি পদের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে তেত্তাল্লিশ বার। কোন পদের শেষে বাসলীর বন্দনা সহ 'বড়ু চণ্ডীদাস', কোনটিতে বাসলীর বন্দনা সহ 'চণ্ডীদাস', 'বড়ু চণ্ডীদাস' এবং 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস'। বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার সংখ্যাই বেশী। কেহ কেহ বলেন তাঁর নাম 'অনন্ত', চণ্ডীদাস উপাধি। তবে শুধু 'অনন্ত' কোথাও পাওয়া যায়নি— সব জায়গাতেই বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে অনন্ত যুক্ত হয়ে আছে। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর যথার্থ নাম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাইরে পদাবলীতে যে ভণিতা পাওয়া গেছে সেখানে দীন, দ্বিজ, বড়ু বা শুধু চণ্ডীদাস ব্যবহৃত হয়েছে— কোথাও চণ্ডীদাসের সঙ্গে 'অনন্ত' ব্যবহৃত হয়নি। মোটকথা, সঠিক প্রমাণ না পাওয়াতে এই চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান আজও সম্ভবপর হয়নি। সে যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস নামে পরিচিত হয়েছেন। আবার হাজার পদ পূর্ণ দীন চণ্ডীদাসের পালাগানেরও এক পুঁথির সন্ধান মেলে, তাতে সমস্যা জটিল থেকে জটিলতরই হয়েছে।

সমস্যার সমাধান না হলেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই কাব্যে কবি বিষয়বস্তু হিসাবে রাধা-কৃষ্ণ ও বড়াইকে গ্রহণ করে উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা প্রকাশ করেছেন। এ কাব্যকে তিনি নানা খণ্ডে বিভক্ত করেছেন, যেমন— জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধা বিরহ ইত্যাদি। এ ছাড়া কাব্যটির ভাষা অর্বাচীন। কথিত আছে এই কাব্য গীতিনাট্য শ্রেণীর কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা বিচার করলে দেখা যায় যে, পদাবলী ও কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার কোন সাদৃশ্য নেই।

পদাবলীর ভাষা— 'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম', আর কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা— 'কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে'। দেখা যায় এখানে ভাষার পার্থক্য অনেক। তবে কৃষ্ণকীর্তনের পদে রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর মধ্যেও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাচীন বাংলার আদি গীতিনাট্যের রূপ থাকলেও এ কাব্য রাগ-রাগিণী ও তাল সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ সংগীতেরই প্রতিচ্ছবি। কাব্য, সংগীত ও গীতিনাট্যের দিক্ থেকে বিচার করলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

এই পুঁথির রচনাকাল নিয়ে অনেক মতভেদ আছে।[১৮] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এর রচনাকাল ১৩৫০ থেকে ১৪০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

আবার শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পুঁথির ভাষা ১৪০০ অথবা ১৪৫০ খ্রীস্টাব্দের আগে হতে পারে না। আবার কেহ কেহ মনে করেন ১৫০০ থেকে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পুঁথির রচনাকাল। কাজেই এখানেও সমস্যা রয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উল্লিখিত কয়েকটি রাগের নাম করা যেতে পারে, যেমন—গুর্জরী, পাহাড়ী, দেসাগ, ধানুষী, কেদার, মল্লার ও ভৈরবী ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন রাগ সংগীতের ধারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিদ্যমান ছিল।

চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর মধ্যেও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। পদাবলীর যে চণ্ডীদাস, তিনি পূর্বরাগ রসপর্যায়ের পদে সিদ্ধহস্ত বলে কথিত। পূর্বরাগ ভিন্ন অপর রসপর্যায়ের পদও তিনি রচনা করেছিলেন, কিন্তু পূর্বরাগের পদে ছিল তাঁর বিশেষত্ব, এ কথা আলঙ্কারিকরা বলেছেন। এঁদের মতে পদাবলীর চণ্ডীদাস সহজ ও সরল ভাষায় রাধার মনের অভিব্যক্তি তাঁর পদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। পদাবলীর বিষয়বস্তু হল রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা। চণ্ডীদাস তাঁর রাধাকে পূর্বরাগ থেকেই যোগিনী করে তুলেছেন, তাই তাঁর পদে রাধার বর্ণনা এরূপ—

'বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা'।...

দ্বিজ চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাসের কাব্যে ঐশ্বর্যভাব নেই— আছে ভাবের আন্তরিকতা। অনেকে মনে করেন তিনি দুঃখের কবি, তাই তিনি পূর্বরাগ থেকেই বিরহ শুরু করেছেন— আক্ষেপানুরাগে তা বৃদ্ধি পেয়ে পর্যায়ের পর পর্যায়ে অগ্রসর হয়ে ভাব-সম্মেলনের আনন্দ-মুহূর্তেও বেদনাকে প্রকাশ করেছেন পদের মধ্যে, যা অন্য কবির পক্ষে সম্ভব হত কি না সন্দেহ। তিনি বিরহক্লিষ্টা রাধার মনোভাব এই ভাবে ব্যক্ত করলেন—

'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরান গেলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেলো।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভালো॥'

এরূপ মর্মস্পর্শী পদ একমাত্র তাঁর দ্বারাই রচিত হওয়া সম্ভব, যিনি সে-বেদনা উপলব্ধি করেছেন। রাধার বেদনা যেন তাঁরই বেদনা। এ ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির কথা একটু উল্লেখ করতে হয়। বিদ্যাপতি রাধার বেদনাকে অনুভব করেছেন, কিন্তু সে বেদনা রাধারই, তাঁর নয়। চণ্ডীদাসের পদাবলী সেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, যার প্রাণ আছে— অনুভব আছে। তিনি আত্মবিস্মৃত কবি—ভাবের ঘোরে তিনি তাঁর কাব্য রচনা করে গেছেন। কোথাও ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি নেই বা আড়ম্বর নেই, আছে ভাবের গভীরতা। সব দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর কাব্যের বেশীর ভাগ পদেরই রূপ সম্পূর্ণ নয়। তবে তাঁর কাব্যে ভাবের নিবিড়তা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু রূপ সৃষ্টির দিকে কবি তেমন মনঃসংযোগ করতে পারেননি। একটি পদে তিনি লিখেছেন—

'চলে নীল সাড়ী নিঙারি নিঙারি
পরান সহিত মোর'।...

এইরূপ রোমান্টিক রসানুভূতি কবি খুব অল্প জায়গায়ই প্রকাশ করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর কাব্যে ভক্তিপ্রাণতারই জয় হয়েছে। আত্মনিবেদনের পদে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে বিশেষ ভাবে। অন্য কবিরাও আত্ম-নিবেদনের পদ রচনা করেছেন, তবে চণ্ডীদাসের আত্মনিবেদনের পদের তুলনা হয় না। যেমন—

'তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভয়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল-মন্দ নাহি জানি
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণ খানি॥'

এখানে চণ্ডীদাসের রাধা জাগতিক সমস্ত কলঙ্ক তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছেন। আত্মনিবেদনের এমন সুন্দর ভাব ও রূপ অন্য কবির রচনায় বিরল।

বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ উভয়ই

বাংলা সাহিত্যের গর্বের বস্তু এবং উভয় কাব্যই পাঠকদের মনে অভূতপূর্ব আনন্দ এনে দিয়েছে, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের সমস্যা আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি মিথিলা রাজসভার কবি ছিলেন ও পঞ্চদশ শতকে মিথিলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজা-রাজমহিষী সম্বন্ধে তিনি তাঁর পদাবলীর ভণিতায় উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বিদ্যাপতির জীবনকালের একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। বিদ্যাপতির জীবন ১৩৮০ থেকে ১৪৬০ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত।

বিদ্যাপতির বেশীর ভাগ পদ লেখা মৈথেলি ও অবহট্ট বা অপভ্রংশ মিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষায়। ব্রজবুলি কোন প্রাদেশিক অঞ্চলের লিখিত বা কথ্য ভাষা ছিল না— এ হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের মধুর রস প্রকাশ করবার উপযোগী সুললিত ভাষা, পদের মাধুর্য ও ধ্বনির চূর্ণ-ঝঙ্কার বিশিষ্ট কবিসৃষ্ট কাব্য ভাষা। খুব সম্ভব বিদ্যাপতিই এই ভাষার প্রবর্তন করেন। বাংলার প্রধানতম ভাব-ধারার উৎস হচ্ছে বৈষ্ণব সাহিত্য আর বিদ্যাপতিই হচ্ছেন এই সাহিত্যের মূল প্রেরণার আধার। তিনি সাধক কবি হিসাবে ও মহাজন পদকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন আর বাংলাদেশে তাঁর সমাদর হয়েছে বেশী। অন্য কবিদের তুলনায় বিদ্যাপতি মুখ্যত প্রেমের কবি ছিলেন এবং মৈথেলি, অপভ্রংশ ও ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনা করে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন।

কিন্তু বিদ্যাপতি শুধু বৈষ্ণব পদ রচনা করেননি— তাঁর রুচি বিচিত্র ও বহুমুখী এবং পঞ্চদশ শতকে তিনি ছিলেন এক পরম বিস্ময়। তিনি বহুভাষাবিদ্ ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। সে যুগে তিনি যে একজন মনীষা সম্পন্ন ও নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তবু পদকর্তা রূপেই বিদ্যাপতির মুখ্য পরিচয়। তিনি তাঁর পদের মধ্যে যে রস ও রূপমুগ্ধতার সুর যোজনা করে গেছেন তা চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে তিনি নানা স্তরে বিভক্ত করে

একটি মানবিক প্রেম কাহিনী কল্পনা করলেন এবং তার মধ্যে অধ্যাত্ম তাৎপর্য আরোপ করলেন। তাঁর পদকে অনুসরণ করেই পরবর্তী কবি ও আলঙ্কারিকরা এই প্রেমকে পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ প্রভৃতি বিভিন্ন পালাতে বিন্যস্ত করে একটি নির্দিষ্ট রস-পরিণতি দিলেন এবং পদাবলীর শেষে কবি তাঁর নিজ মন্তব্য প্রকাশ করে নিজের নাম যুক্ত করলেন।

বিদ্যাপতির ভাবকল্পনার একটি বিশেষ রূপ আছে। প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি। নিজ প্রতিভা ছাড়া পরিবেশও খানিকটা তাঁকে সাহায্য করেছে এ বিষয়ে। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার কবি। রাজসভার পরিবে'.' কলমুখরিত, আড়ম্বরময়, আলোকোজ্জ্বল। তাই বিদ্যাপতির পদ সব দিক্ দিয়েই ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তাঁর সাহিত্য উচ্চস্তরের। তিনি রাধাকে ভাবমুগ্ধা কিশোরী রূপে অঙ্কন করে তার মধ্যে প্রেমের উন্মেষ দেখিয়ে তাকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রেমকাব্যের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী তিনি। বক্তব্যে, রীতিতে বিদ্যাপতি ভারতীয় প্রেমকাব্যের ধারাকে অনুসরণ করেছেন। রাধা-কৃষ্ণ পদাবলী ও লৌকিক প্রেমপদাবলী ছাড়াও বিদ্যাপতি শিবপদাবলী রচনা করেছিলেন। তবে পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি যে সমস্ত রস পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন তার মধ্যে 'মাথুর' পদে তিনি এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন ও প্রার্থনা প্রভৃতি পদও বিদ্যাপতি সুন্দর রচনা করেছেন। কথিত আছে পূবরাগ রসপর্যায়ে চণ্ডীদাসই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আলঙ্কারিকরা এ কথাও বলেছেন যে, বিদ্যাপতি কৃষ্ণের পূর্বরাগ পদে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। পূর্বরাগের পদে বিদ্যাপতির উৎকর্ষের কারণ তাঁর কবি-প্রাণের স্বাধর্ম্য, যা ভাব ছেড়ে রূপ, রস ছেড়ে অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ আর কিছুই নয়, তা হল রূপমুগ্ধতা। শ্রীরাধার রূপে শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ আর সেই বিমুগ্ধ প্রাণের উচ্ছ্বসিত ভাব বিদ্যাপতি রচিত কৃষ্ণের পূর্বরাগ পদে অনুপম সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। পূর্বরাগ পদে বিদ্যাপতির কৃষ্ণ বলছেন—

'অপরূপ পেখল বামা
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণ হীন হিমধামা।'... (৬২৩)

এখানে রাধিকার রূপে কৃষ্ণের মুগ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। পূর্বরাগের আর একটি পদ—

'গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি·
চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক
দহই অঙ্গ মোর'···। (৬২২)

এই পদটিতেও বিদ্যাপতি উজ্জ্বল ও অভ্রান্ত ছবি অঙ্কন করেছেন যা সে যুগে অপর কোনও কবির দ্বারা সম্ভব হয়নি। কবি এখানে উপমা ও উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। এর পর অভিসার-রস পর্যায়ের 'পদ আলোচনা' করা যাক।

বিদ্যাপতির অভিসার রসপর্যায়ের পদ—

'জলধর অম্বর রুচি পহিরাউলি
সেত সারদ কর বাম।'···

এই রস পর্যায়ের পদে কালিদাস ও জয়দেবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যাপতির রাধার সৌন্দর্যময়ী রূপটি আমাদের কালিদাসের অভিসারিকা বা জয়দেবের শ্রীরাধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিদ্যাপতির পদে বহুমুখী বিচিত্রতার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত পদে বিদ্যাপতি রাধার রূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন— 'রমনীকে মেঘরুচি বসন পরাইলাম— তার বাম হস্তে শ্বেত কমল ও দক্ষিণ হস্তে পান শোভা বৃদ্ধি করিতেছে— সুন্দরী গজ গমনে চলিল।' এখানে কালিদাসীয় চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অভিসারের অপর একটি পদে নিজের মনের কথা রাধার সখীকে দিয়ে বলিয়েছেন—

'মৃগমদ পঙ্ক অলকা
মুখ জনু করহ তিলক।'··· (৯৭)

অর্থাৎ সখী রাধাকে বলছেন— 'অলকে মৃগমদ চন্দন ও মুখে তিলক করিও না —সুন্দর যে পূর্ণিমার চন্দ্র, তা তিলকে ম্লান হইয়া যাইবে।' স্বভাবতই রাধা সুন্দরী, সাজসজ্জার কি প্রয়োজন আছে তাঁর? এখানে প্রসাধনের অপ্রয়োজনীয়তার কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এত সুন্দর প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ অপর কবির পদে খুব কমই পাওয়া গেছে। তবে বিদ্যাপতি ছাড়া জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায় শেখর, রাধামোহন প্রভৃতি পদকর্তাগণও অভিসারের পদ রচনা করেছেন। এর মধ্যে অভিসারের পদে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন এ কথা আলঙ্কারিকরা বলেছেন। তিনি নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তাঁর অভিসার রসপর্যায়ের পদগুলিকে একটি বিশেষ স্থানে পৌছে দিয়েছেন। যদিও

বিদ্যাপতির পদে কল্পনার মৌলিকতা অনেক বেশী, কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তী যুগে কবি গোবিন্দদাস চৈতন্য-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কাব্যের মধ্যে অধ্যাত্ম-ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর কাব্যে সংগীতের হিল্লোল বয়ে গেছে। কিন্তু বিদ্যাপতির কাব্যে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায়নি।

'মাথুর' রসপর্যায়ের পদ আলোচনা করতে গেলে একথা প্রথমেই বলতে হয় যে, বিদ্যাপতি 'মাথুর' রসপর্যায়ের পদে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। কৃষ্ণের মথুরা গমনের পর রাধার বিরহ রূপটি বিদ্যাপতি তাঁর মাথুরের পদে খুব সুন্দর পরিবেশন করেছেন। বিদ্যাপতির রাধা বলছেন—

'অব মথুরাপুর মাধব গেল
গোকুল মাণিক কে হরি নিল।'...

এখানে রাধার বৈকল্য ভাব দেখা দিয়েছে। তিনি বলছেন—যে কৃষ্ণ গোকুলের মাণিক, তাকে কে হরণ করে নিয়ে গেল? এত সুন্দর অন্তঃস্পর্শী অভিব্যক্তি—এ বিদ্যাপতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। অপর একটি পদে বিদ্যাপতির রাধা বলছেন—

'এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর'...।

আবার রাধা বলে উঠলেন—

'কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া'...।

বিদ্যাপতির রাধা বলছেন— 'আমার দুঃখের সীমা নাই। এই ঘন ঘোর বর্ষার রাত্রি— বর্ষার মত্ত হাওয়ায় ময়ূর নৃত্য করিতেছে, কিন্তু আমার গৃহ শূন্য।'

বিদ্যাপতির অপর একটি মাথুরের পদ—

'অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করিব বারিদ মেহে।'...

এখানে রাধা বলছেন— 'অঙ্কুর বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি রবি-তাপে দগ্ধ হইয়া যায় তখন জলপূর্ণ মেঘে আর কি করিতে পারে?'

কবি-চিত্ত এখানে আবেগে স্পন্দিত এবং রূপ নির্মাণের অনুপম কৌশলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ব্যঞ্জনা ধ্বনি ও অলঙ্কার সৌষ্ঠবে এই পদ কাব্যশ্রী লাভ করেছে। এর মধ্যে একটা ঐশ্বর্য ভাব আছে।

মাথুরের পদে বিদ্যাপতি হচ্ছেন পূর্ণতর কবি। পরিবেশ চিত্রণে ও চরিত্র

অঙ্কনে বিদ্যাপতির পদে বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তিনি আজীবন সৌন্দর্য চর্চা করেছেন তাই তাঁর কাব্যের ভাববস্তু পাঠকদের আনন্দ দিয়ে থাকে। বিদ্যাপতি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি, তাই তাঁর পদে রাধা-ভাবের কথা নেই। রাধার জন্ম হয়ত অন্য কবি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে লালন করে যৌবন-স্বর্গে উন্নীত করেছেন জয়দেব ও বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির রাধা একেবারে লৌকিক। আলঙ্কারিকরা বলেন যে, বিদ্যাপতির কাব্য আলো ও ছায়ার মাঝামাঝি এক অসীম রহস্য বয়ে আনে। বিদ্যাপতির কাব্যে আনন্দ ও বেদনা যে ভাবে রূপায়িত হয়েছে তাতে তাঁকে সার্থক শিল্পী ও কবি বলতে হয়। বিরহ-কাব্যে অন্যান্য বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা বিদ্যাপতির বিশিষ্টতা স্বতঃই চোখে পড়ে। পরবর্তী যুগের পদকারগণ তাঁকে অনুসরণ করে চৈতন্য-ভাবকে পদের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে বহু পদ রচনা করেছেন।

বিদ্যাপতি ভাব-সম্মেলনেরও বহু সুন্দর পদ রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে যে অনুভূতির নিবিড়তা ছিল, তা ভাব-সম্মেলনের পদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ভাব-সম্মেলনের একটি পদ—

'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥'…

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিকার যখন ভাবরাজ্যে মিলন হল, তখন রাধার মনে হল যে তাঁর জীবন যৌবন সবই সফল হয়েছে আর দশদিক প্রসন্ন হয়েছে। আনন্দময় ভাবলোকে এইভাবে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটেছে।

কবি বিদ্যাপতি রচিত নানা রসপর্যায়ের পদ বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ। পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতির দান অতুলনীয়— তিনি নিজ প্রতিভা বলে নানা পর্যায়ের পদ রচনা করে গেছেন যা ভাবে, সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এ সমস্ত পদ রাগ ও তাল সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ আমাদের সংগীত ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ।

চৈতন্যদেব

ভক্ত কবিরা চৈতন্যদেবের জীবন কাহিনী অবলম্বনে যে জীবনী কাব্য রচনা করে গেছেন, সেই কাব্য থেকে আমরা তাঁর জীবনের অপূর্ব কাহিনীগুলির পরিচয় পাই।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' আমরা চৈতন্যদেবের বাল্যকালের ঘটনা-বলীর বর্ণনা পাই আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে তাঁর জীবনের অলৌকিক কাহিনী ও দিব্যোন্মাদ ভাবের বর্ণনা পাই।

শ্রীচৈতন্যের দেশ শ্রীহট্টে। তাঁর পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। বিদ্যার্জনের নিমিত্ত তিনি নবদ্বীপে বাস করতে শুরু করেন এবং সেখানেই শচীদেবীকে বিবাহ করে তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

তাঁদের প্রথম সন্তান বিশ্বরূপ অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে যান আর অপর কতিপয় সন্তান শৈশবেই পরপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান দোল-পূর্ণিমার দিন জন্মগ্রহণ করেন। এই সর্ব কনিষ্ঠ সন্তানই পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যদেব নামে অভিহিত হয়েছেন। ইনি বাল্যকালে নিমাই নামে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী কালে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের পর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে অভিহিত হন। ঐ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামকেই সংক্ষেপে বৈষ্ণবভক্তরা চৈতন্যদেব বলতেন।

তাঁর বাল্যকালের ঘটনা 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে যা পাওয়া গেছে তাতে মানবিকতার রূপটি খুব সুন্দর ফুটে উঠেছে। নিমাই শিশুকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন এবং প্রতিবেশীদের নালিশে শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। গঙ্গায় স্নানার্থীরা স্নান শুরু করলে ছোট নিমাই জলে নেমে তাদের পা' ধরে টানাটানি করতেন—কখনও বা মুখে জল নিয়ে অপরের গায়ে ছিটিয়ে দিতেন, আবার মেয়েরা পূজার ফল, ফুল ও চন্দন ইত্যাদি নিয়ে পূজা দিতে গেলে রাস্তায় তাদের পূজার সামগ্রী সব নিজে নিয়ে নিতেন। শিশুসুলভ চপলতা তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল। তবে বুদ্ধি ছিল প্রখর। তাঁকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হলে সেখানে তিনি ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন

আর অতি অল্প সময়ে সব আয়ত্ত করে নেন। কৈশোরে নিজে একটা টোল খোলেন। এই টোলে বহু ছাত্র ছিল এবং ছাত্রদের তিনি অতি যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন।

খুব অল্পবয়সে তাঁর বিবাহ হয় লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেই স্ত্রী সর্প দংশনে মারা যান। এরপর জগন্নাথ মিশ্র দেহরক্ষা করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসে নিমাই লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন, কিন্তু মাতা শচীদেবীর অনুরোধে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে পিতৃপিণ্ড দিতে তিনি গয়াধামে যাত্রা করেন এবং সেখানে গদাধরের পাদপদ্মে পূজা নিবেদন করবার সময়ে তাঁর অন্তর সহসা কৃষ্ণ-প্রেমে ও কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেখানে ঈশ্বরপুরী তাঁকে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের মধ্যে তখন এক উন্মত্ত ভাব এবং সেই ভাব নিয়েই গৃহে ফিরে যান। এই সময় থেকে তাঁর মধ্যে এক বিরাট ভাবান্তর দেখা যায়। মুখে কৃষ্ণনাম আর দুই চোখে অশ্রুধারা বয়ে চলেছে। তাঁর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে শচীদেবী শঙ্কিত হন এবং এই কারণে চৈতন্য-দেবকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের পরও তাঁর কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। এর কিছুদিন পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নিজ স্ত্রী ও মাতাকে পরিত্যাগ করে কাটোয়ায় কেশব-ভারতীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা নেন। কেশবভারতী দৈব আদেশে এই নবীন সন্ন্যাসীর নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর। তাঁর জীবনের বিশেষ ঘটনাবলীর মধ্যে 'কাজীদলন' ও 'জগাই-মাধাই' উদ্ধার দুটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি পরিব্রাজকের বেশে ভারতের নানাস্থানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলেন এবং এই উপলক্ষ্যে পুরীধামে যাত্রা করেন। সেখানে অদ্বৈতপন্থী বাসুদেব সার্বভৌম নবীন সন্ন্যাসীর ধর্মমত স্বীকার করে নিয়ে নিজ মত ত্যাগ করেন।

এরপর তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন ঘটে ও সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়। চৈতন্য-জীবনের এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে তাঁর দিব্যোন্মাদ ভাবের প্রকাশ পায়। এরপর পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। বৃন্দাবন থেকে ফিরে আবার পুরীধামে যান এবং জীবনের শেষদিন

পর্যন্ত এখানেই ছিলেন আর বেশীর ভাগ সময়ই দিব্যভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন।

কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে, তিনি এই ভাবের বশবর্তী হয়ে সমুদ্রের নীল জলরাশিকে কৃষ্ণ ভ্রম করে তাতে ঝাঁপ দিতেন এবং অনেক কষ্টে ভক্তরা তাঁকে উদ্ধার করতেন। শেষ জীবনটা তাঁর এই দিব্যোন্মাদ ঘোরেই কেটেছে। ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিব্যধামের যাত্রী হন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' তাঁর তিরোধানের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। জয়ানন্দ বলেছেন তিনি ভাবের ঘোরে নৃত্য করতে থাকলে পায়ে ইটের টুকরো বিঁধে তাঁর জীবনাবসান হয়। আবার কেহ কেহ বলেন তিনি নাকি জগন্নাথের শরীরের সাথে লীন হয়ে গেছেন। তিনি মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বেঁচেছিলেন, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মকে এমন এক উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আর অপর কারও দ্বারা সম্ভব হয়নি। তাঁর আবির্ভাবে বাংলাদেশ তথা ভারতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তার প্রধান উৎস শ্রীচৈতন্যদেব। তিনিই নগর-সংকীর্তন ও নাম-কীর্তনের প্রবর্তক এবং তাঁর জীবনের বিচিত্র ভাবকে অবলম্বন করে পরবর্তী কবিগণ অপূর্ব সব পদ রচনা করেছেন। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তদের নিয়ে নাম-কীর্তনে মেতে থাকতেন এবং কীর্তনের সময় চৈতন্যদেবের মধ্যে নানা ভাবের সমাবেশ হত। প্রত্যক্ষদর্শীরা এ সমস্ত ভাবকে অবলম্বন করে তাঁদের পদের মধ্যে চৈতন্যদেবের বিভিন্ন ভাবের ছবি অঙ্কন করেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মতানুসারে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ।

কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তিনটি ইচ্ছা পূর্ণ করবার অভিপ্রায়ে শচীদেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন নিমাই রূপে। তাই তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃরাধা রূপে অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণ ও বাইরে রাধাভাব নিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে থাকতেন। এই রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের রূপই পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের পদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। গোবিন্দদাস তাঁর পদে এই ভাবের ছবি অঙ্কন করেছেন, যেমন—

'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়

ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মুরছা যায়'…।

এখানে গোবিন্দদাস রাধাভাবের এক চমৎকার ছবি অঙ্কন করেছেন। গোবিন্দ-দাস এই ভাবের আর একটি ছবি অঙ্কন করেছেন অপর একটি পদে, যেমন—

'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।'…

গোবিন্দদাস ভিন্ন জ্ঞানদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাসেরও বহু পদ আছে এই ভাবের উপর ভিত্তি করে। চৈতন্যদেব পিতৃপিণ্ড দিয়ে গয়াধাম থেকে ফিরে আসবার পর রাধাভাবে সমাহিত হয়ে থাকতেন, তারই প্রকাশ ঘটেছে পরবর্তী যুগের কবিদের পদের মধ্যে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পদাবলী সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে এবং বৈষ্ণব পদকর্তারা আধ্যাত্মিক ভাব, নানা উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও ছন্দ প্রয়োগ করে পদগুলির মাধুর্য বৃদ্ধি করেছেন। প্রাক্-চৈতন্যযুগে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণের অবলম্বনে সুন্দর সব পদ রচনা করেছেন, কিন্তু পরবর্তী পদকারেরা তাঁদের পদে অধ্যাত্মভাব আরোপ করে চৈতন্যদেবের রাধাভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সমস্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ এবং বাংলাদেশের সংগীত জগতেও এ সমস্ত পদাবলী মহামূল্যবান্।

এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, চৈতন্যদেব তাঁর নাম-কীর্তনের মধ্যে রাগ-রাগিণী ব্যবহার করেছেন। তিনি শিষ্যদের যে কীর্তন শিক্ষা দিতেন তাও রাগ সমন্বিত। পরবর্তীকালে পদাবলী কীর্তনেও ঐ রূপ রাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এ সমস্ত পদাবলী আমাদের বাংলা সংগীত ভাণ্ডারের এক বিশিষ্ট সম্পদ।

বৈষ্ণব পদাবলী

'পদাবলী' শব্দের উৎস হল জয়দেবের 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী' থেকে। বৈষ্ণব তত্ত্বের বিষয়বস্তু নিয়ে যে কাব্য বা পদ রচিত হয়েছে তাকেই 'বৈষ্ণব পদাবলী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পদাবলী কাব্য বুঝতে হলে প্রথমেই সমষ্টিগত বৈষ্ণব ভাবকে চিনতে হবে। 'বৈষ্ণব পদাবলী'র বিষয়বস্তু হল রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা। 'পদাবলী' প্রাক্-চৈতন্যযুগে রচিত হলেও 'বৈষ্ণব

পদাবলী' বলতে যা বোঝায় তা উৎকর্ষ লাভ করেছে চৈতন্য-পরবর্তী যুগে। প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলী সাহিত্যের পদকর্তাদের মধ্যে প্রথমেই তিনজনার নাম উল্লেখ করতে হয়—জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস ও কবি বিদ্যাপতি। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পদাবলী সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ। এই কাব্যের বিষয়বস্তু হল রাধা-কৃষ্ণ মিলনলীলা। গীতগোবিন্দে যে রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে তা পদাবলী সাহিত্যের এক পরম বিস্ময়।

জয়দেবের রাধা বিলাস-কলা নিপুণা, প্রগলভা, রূপলাবণ্যময়ী। কৃষ্ণদর্শনে মুগ্ধ হয়ে রাধা আকুল ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করছেন—অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবধূগণের সঙ্গে রাসলীলায় রত। শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলার যে বর্ণনা আছে, তা হচ্ছে শারদ রাস আর জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাই বাসন্তী রাসলীলার কথা। জয়দেব এই রাসলীলার যে বর্ণনা দিয়েছেন গীতগোবিন্দে, তা অভিনব। গীতগোবিন্দে জয়দেব অপূর্ব ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং ছন্দ ব্যবহার করেছেন ত্রিপদী ও পয়ার। এই কাব্য সংগীত-ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ। বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা, ছন্দ ও সংগীতের ঝঙ্কার সব কিছু মিলে গীতগোবিন্দ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। পরবর্তীকালের কবিরা এর দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

এর পর বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যটিকে চণ্ডীদাস নানা খণ্ডে বিভক্ত করেছেন, যেমন— জন্মখণ্ড, নৌকাখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ ইত্যাদি আরও বহু খণ্ডে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এই পুঁথিটি আবিষ্কার করেন।

এই গ্রন্থে প্রত্যেক খণ্ডেরই শেষ পত্রটি নেই তবে প্রত্যেক গান বা কবিতার শেষে ভণিতায় কবির নাম পাওয়া গেছে। আলঙ্কারিকরা বলেন যে, মূল গ্রন্থখানির মধ্যে তিনরকমের হস্তাক্ষর পাওয়া গেছে; যেমন—প্রাচীন হস্তাক্ষর, প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর। গীতগোবিন্দ উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক নাট্যকাব্যের ধরনে লিখিত, তাতে নাটকীয় ঘটনার চেয়ে মহাকাব্যোচিত স্বভাব-বর্ণনারই আধিক্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয় ঘটনারই প্রাধান্য বেশী। কবি রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই-এর উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নাট্যকাব্যের মতো রস ও ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। গীতগোবিন্দ যেমন সংগীতবহুল কাব্য তেমনই শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্তনের কবিতাগুলিও গেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস জয়দেবের গীত-গোবিন্দ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

এরপর কবি বিদ্যাপতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাপতি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে বহু পদ রচনা করে গেছেন। তাঁর কাব্য উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে ভূষিত। তাঁর কাব্যে ঐশ্বর্য ভাব প্রবল। বিদ্যাপতির পদের মধ্যেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের ছন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, অতএব পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই।

বিদ্যাপতি 'ব্রজবুলি' ভাষায় পদ রচনা করেছেন আর তাঁর পদাবলীর ছন্দে জয়দেবের ছন্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, চৈতন্যদেব গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাপতির পদাবলীর রস আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করতেন।

চৈতন্যদেবের সময়ে গোবিন্দ আচার্য নামে একজন পদকর্তা ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। কারণ তাঁর চৈতন্যলীলা বিষয়ক পদের মধ্যে কিছু কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। তিনি পদের শেষে ভণিতায় 'গোবিন্দদাস' নাম ব্যবহার করেছেন; ফলে গোবিন্দদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজের পদের মিশ্রণ ঘটেছে বলে আলঙ্কারিকরা মনে করেন।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলীতে রাধাকে লৌকিক নায়িকা রূপে অঙ্কন করা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কাব্যে পদকারগণ রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্য-দেবের রূপ বর্ণনা করে পদ রচনা করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের পদকর্তা-গণ প্রাক্-চৈতন্যযুগের কাব্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেও তাঁদের কাব্যে ভক্তি-রসের বন্যা বয়ে গেছে। এর কারণ হল চৈতন্যভাব। প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদকর্তাগণ তাঁদের কাব্যকে যেমন কতকগুলি লীলা বা খণ্ডে বিভক্ত করেছিলেন, পরবর্তী পদকর্তাগণও তেমনই তাঁদের পদাবলী কাব্যকে বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, মাথুর ও ভাব-সম্মেলন ইত্যাদি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এ ছাড়া গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও রচনা করেছেন।

চৈতন্য-সমসাময়িক পদকর্তাগণের মধ্যে নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ আচার্য, নিত্যানন্দ, ভক্ত বলরাম দাস, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন প্রমুখের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। এঁরা চৈতন্যভাবের প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেই ভাবকে অবলম্বন করেও পূর্ব-

সুধীদের ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি আহরণ করে নিজেদের পদসমূহকে অপূর্বসাজে সজ্জিত করেছেন। এ ছাড়া শ্রীনিবাস আর নরোত্তম ঠাকুরও বহু সুন্দর পদ রচনা করে গেছেন। মধ্যযুগে পদাবলী সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে ওঠে।

চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের মধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরাম দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রায়শেখরও বহু পদ রচনা করেছেন। কথিত আছে পূর্বরাগ রসপর্যায়ের পদে দ্বিজ চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পূর্বরাগের পদ, যেমন—

'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।...

রাধা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে আকুল হয়ে উঠেছেন আর সেই আকুলতা ও উদ্বেগ ভাব প্রকাশ পেয়েছে এই পদে। অনুভূতির গভীরতায় ও অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনায় পদটি অতুলনীয়। চণ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় রাধার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন পদাবলীর মাধ্যমে। পূর্বরাগ রসপর্যায়ের পদে চণ্ডীদাস অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলেও অন্যান্য রসপর্যায়ের পদও তিনি রচনা করেছেন। সেগুলির উৎকর্ষও কম নয়। জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানদাসের পদে আছে ভাববৈচিত্র্যের আধিক্য। এ ছাড়া জ্ঞানদাস কোন কোন পদে প্রসাধন কলা ও মণ্ডন কলার দিকে লক্ষ্য দিয়েছেন।

জ্ঞানদাস রচিত রূপানুরাগের একটি বিখ্যাত পদ এখানে উল্লেখ করা হল, যেমন—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'।...

এখানে অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে। জ্ঞানদাস ভাব, ভাষা ও ছন্দ দিয়ে রাধার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন পদাবলীর মাধ্যমে।

এরপর গোবিন্দদাসের পদের উল্লেখ করতে হয়। গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়। গোবিন্দদাস বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষায়ই অজস্র পদ রচনা করেছেন, তবে ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলিই উৎকৃষ্টতর। গোবিন্দদাস সচেতন শিল্পী—শব্দ চয়নে ও অলঙ্কার প্রয়োগে কুশলী ছিলেন।

সমালোচকদের মতে গোবিন্দদাস অভিসার রসপর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর বিখ্যাত অভিসার রসপর্যায়ের পদে তিনি রাধার অভিসার যাত্রার প্রস্তুতিপর্বের অপূর্ব চিত্র অঙ্কন করেছেন, যেমন—

'কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি,
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।'…

এই পদটির মধ্যে রাধার অভিসার যাত্রার নিমিত্ত কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের রূপটি আমরা দেখতে পাই। কৃষ্ণসকাশে পৌঁছাবার জন্য রাধা মাটিতে কাঁটা পুতে ও আঙিনায় জল ঢেলে পথ চলা অভ্যাস করছেন যাতে দুস্তর কঠিন পথে অভিসার যাত্রা কালে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। অভিসার রসপর্যায়ের পদে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখলেও অন্যান্য পদও তিনি রচনা করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের রূপ বর্ণনা তাঁর পদের মধ্যে যেমনটি প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা নেই। যথা—

'নীরদ নয়নে | নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব'…।

চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে জয়দেবের পদে এইরূপ ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। জয়দেবের পদ—

'রজনি জনিত গুরু | জাগর রাগক
ষায়িতমলসনিমেষম্'।

এরপর বলরাম দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনিও চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি। তিনি বাৎসল্য রসের কবি। যদিও বাৎসল্য রসপর্যায়ে রায়শেখর ও বংশীবদন প্রমুখ কয়েকজন পদকর্তা সুন্দর পদ রচনা করেছেন, তবুও বলরাম দাসকেই বাৎসল্য রসপর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। মাতা যশোদার পুত্রের নিমিত্ত যে আকুতি তা বলরাম দাসের পদে সুন্দর ফুটে উঠেছে। যেমন—

'আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি'…।

এখানে মাতৃহৃদয়ের আকুতি চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আবার—

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম তার পাছে।

তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও,
মাঠে বড় রিপুভয় আছে ॥…

এখানে পুত্রের শুভাশুভের চিন্তায় মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—এই ভাবটি ব্যক্ত করেছেন বলরাম দাস তাঁর পদের মধ্যে। মা যশোদার এখানে আত্মবিস্মৃত অবস্থা। সকলেই শিশু, কিন্তু মা যশোদা চান সকলের মাঝখানে যেন কৃষ্ণ থাকে, তাহলে বিপদের সম্ভাবনা কম। পুত্রের জন্য মাতার এই স্বার্থপরতার মধ্যে একটা মধুর ভাব আছে যা অনির্বচনীয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর কথা আলোচনা করতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রাক্-চৈতন্যযুগ অপেক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগেই বৈষ্ণব পদাবলী সমধিক মনোহর রূপ পরিগ্রহণ করে পাঠকদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে। এই যুগের পদাবলীর মধ্যে রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের রূপটি বড় চমৎকার ফুটে উঠেছে, যা প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলীর মধ্যে প্রকাশ পায়নি। তখন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাই ছিল কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়, আর পরবর্তী কবিরা রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করলেও ভাবের দিক্ দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। যুগ হিসাবে পদাবলীর ভাবের পরিবর্তন হয়েছে। কথিত আছে 'খেতুরী' উৎসবে যে সমস্ত বৈষ্ণব একত্রিত হন, তাঁদের মধ্যে ভাবের ভিন্ন ভিন্ন রূপের জন্য এক একটি 'ঘরানা'র সৃষ্টি হয়। যেমন—মনোহরশাহী ঘরানার প্রবর্তন করেন নরোত্তম দাস। এক এক সম্প্রদায় এক একটি ঘরানা প্রবর্তন করেন।

এ ছাড়া বৈষ্ণব পদাবলী ছন্দ-বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। পদাবলী সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দেরই প্রাচুর্য দেখা যায়, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দেরও অভাব নেই। আধুনিক যুগেও ছন্দের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন এবং ভণিতায় নিজেকে 'ভানুসিংহ' বলে অভিহিত করেন।

মুসলমান কবিগণও এই বৈষ্ণব ভাবসমৃদ্ধ কবিতার সংস্কার থেকে নিজেদের পুরাপুরি মুক্ত রাখতে পারেননি। ভাব, ভাষা, অলঙ্কার ও ছন্দে সজ্জিত হয়ে পদাবলী এক অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে এবং পাঠকবৃন্দ এর রস আস্বাদন করে এক স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যমূল্য বিচার করতে গেলে এর ভাষার ঐশ্বর্যের কথা

উল্লেখ করতে হয়। ব্রজবুলি, সংস্কৃত মিশ্র ব্রজবুলি, ব্রজবুলি মিশ্র বাংলা প্রভৃতি পদাবলীর ভাষা বৈষ্ণব পদকর্তাগণ ব্যবহার করেছেন।

সমস্ত আলোচনা শেষে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বৈষ্ণব পদাবলী কেবলমাত্র বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের রস ভাষ্যই নয়— কাব্য হিসাবে সর্বদেশের সর্বকালের পাঠকদের আস্বাদনের বস্তু আর বাংলার সংগীত জগতে এর দান অতুলনীয়।

কীর্তন

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, কোন দেব দেবী বা মহামানবের যে যশোগাথা গান করা হয়, তাকেই কীর্তন বলে এবং পদাবলী ভগবানের যশোগান বলেই তাকে কীর্তন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে চর্যাযুগ থেকে প্রবন্ধগীতির মধ্য দিয়ে কীর্তনের প্রকাশ ঘটেছে।

প্রবন্ধগান সম্পর্কে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বলেছেন যে ১১শ-১২শ শতাব্দীতে প্রবন্ধগান তার আদি রূপ থেকে অভিজাত সংগীতে পরিবর্তিত হয়েছে। এ ছাড়া শার্ঙ্গদেবের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্রবন্ধ-গানের নিয়মাবলীর সঙ্গে কীর্তনের নিয়মাবলীর মিল আছে। প্রবন্ধগান সম্পর্কে শার্ঙ্গদেবের উক্তি : প্রবন্ধ গান ছয় অঙ্গ যুক্ত। এই ষড়ঙ্গ হল— স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল। শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বলেছেন যে এই ষড়ঙ্গযুক্ত প্রবন্ধগানই হল কীর্তন।

এখন কীর্তন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি। জয়দেবের সময় থেকে পদাবলীর শুরু এবং যুগ ও কাল হিসাবে তা নতুন রূপ ধারণ করে চৈতন্যযুগে। নরোত্তমদাস পদাবলী কীর্তনের এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। কীর্তন বিভিন্ন প্রকারের, যেমন— পদাবলী কীর্তন, পালা কীর্তন, নগর কীর্তন ও নাম সংকীর্তন ইত্যাদি।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের ন্যায় কীর্তনেরও ঘরানা আছে। কথিত আছে 'খেতুরি উৎসবে' সমস্ত বৈষ্ণব মহাজনরা একত্রিত হয়েছিলেন এবং সে সময় থেকে কীর্তনের বিভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি হয়। কীর্তনের ঘরানা প্রধানত চার রকম, যেমন—মনোহরশাহী, গরাণহাটী, রেনেটী ও মন্দারিনী। এ ছাড়া ঝাড়খণ্ডী

নামে আর একটি ঘরানারও উল্লেখ দেখা যায়। 'উচ্চাঙ্গ সংগীতে'র প্রভাব যে কীর্তনের উপর যথেষ্ট পড়েছিল সে কথা আমরা প্রাচীন ইতিহাস থেকেই জানতে পারি। যেমন মনোহরশাহী ঘরানায় খেয়ালের প্রভাব, গরাণহাটী ঘরানায় ধ্রুপদের প্রভাব, রেনেটীতে টপ্পার প্রভাব ও মন্দারিনীতে ঠুংরীর প্রভাব বিদ্যমান। কারও মতে মনোহরশাহীর প্রবর্তক নরোত্তম দাস, রেনেটীর প্রবর্তক শ্রীনিবাস ও গরাণহাটীর প্রবর্তক শ্যামানন্দ। আবার অন্য মতানুযায়ী স্থানের নাম অনুযায়ী পদ্ধতিগুলির নামকরণ হয়েছে। টপ্পার ছাঁচে যে কীর্তন তাকে বলা হয় ঢপ কীর্তন। উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ পদ্ধতিতে যে কীর্তন গান বাঁধা হয়েছিল তা বেশ বিলম্বিত লয়ে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা অনুমেয় যে, উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব কীর্তনকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

তালের দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় কীর্তন গানে যত রকমের তাল প্রচলিত আছে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতেও এত রকমের তাল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি। আলঙ্কারিকদের মতে গরাণহাটী পদ্ধতিতে ১০৮ রকমের তাল ব্যবহৃত হয়, মনোহরশাহীতে ৫৪ রকমের, রেনেটীতে ২৬টি ও মন্দারিনীতে ৯টি তালের উল্লেখ আছে। বাংলার কীর্তন গানে সবচেয়ে বেশী তালের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—রূপক, যতি, তেওট, জপ, বড়দশকুশি, ছোটদশকুশি, দাশপেড়ে, দুঠুকি, একতালী প্রভৃতি এবং আরও অনেক তাল।

রাগ-রাগিণীর দিক থেকে এতে তোড়ী, কামোদ, শ্রীরাগ, পাহাড়ী, পট-মঞ্জরী, রামকেলি, গুর্জরী এবং আরও বহু রাগ-রাগিণীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ কীর্তনকে নানা রসপর্যায়ে ভাগ করেছেন। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের প্রকার ভেদে ৬৪টি রসের কথা উল্লেখ করেছেন বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ। বিপ্রলম্ভ হল পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য এবং প্রবাস। আর সম্ভোগকেও তাঁরা চার ভাগে ভাগ করেছেন। রসের প্রত্যেকটিকে আবার আটটি করে ভাগ করেছেন। এইভাবে চৌষট্টি রসের অবতারণা করা হয়েছে।

কীর্তন গানে পাঁচটি জিনিস ব্যবহার করা হয় যেমন—কথা, আখর, দোহা, ছুট ও তুক্। উক্তি-প্রত্যুক্তি কীর্তনের ব্যাখ্যা যার দ্বারা করা হয় তা হচ্ছে কথা, ছন্দোবদ্ধ কয়েকটি পদের সমষ্টি হল দোহা, যা গায়কেরা ছন্দের মধ্য দিয়ে আবৃত্তি করে থাকেন। আখর দ্বারা কীর্তনের মূল কথাটি সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মূল গায়ক কীর্তনের প্রথম লাইনটি সুরে ও তালে গেয়ে

থাকেন এবং দোহাররা তার পুনরাবৃত্তি করেন। এখানে মাথুর রসপর্যায়ের একটি কীর্তন গান ও আখরের উদাহরণ দেওয়া হল।—

কীর্তন— 'প্রেম কি অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা'...।

আখর— 'আহা মরিরে, হলো না হলো না
যুগল পল্লব যেমন অঙ্কুর তেমনি রইলো'...।

প্রথম দুটি লাইনের অর্থ— প্রেমের অঙ্কুর জন্মলাভ করবার পূর্বেই বিরহের আতপে তা দগ্ধ হয়ে গেল। তাতে পল্লব বিকশিত হওয়ার সুযোগ আর মিলল না। এই কথাটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য আখরে বলা হল—যুগল পল্লব যেমন ছিল, তেমনই রইল আর তা প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পেল না।

কীর্তনে শ্রীখোলের মাধ্যমে তালের বোল বাজানো হয়ে থাকে। এ ছাড়া কীর্তনে করতালও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদাবলী কীর্তনে নানা রসপর্যায়ের উল্লেখ আছে, যেমন— পূর্বরাগ, অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, মাথুর, ভাব-সম্মেলন ইত্যাদি। এই বিভিন্ন রসপর্যায়ে রাধার বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে এক একজন পদকার এক এক রস পর্যায়ের পদে সিদ্ধহস্ত। আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী পূর্বরাগের পদে চণ্ডীদাস, অভিসারের পদে গোবিন্দদাস, মাথুরের পদে বিদ্যাপতি ও বাৎসল্যরসের পদে বলরাম দাস শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। এ ছাড়া পদাবলীর ভাষা ও ছন্দের কথা 'বৈষ্ণবপদাবলী'তে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পালাকীর্তন সম্পর্কে দু-একটা কথা উল্লেখ করছি।

পালাকীর্তনে একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করবার মতো। যেমন মিলন গান—পূর্বরাগই হোক, মানই হোক বা বিরহই হোক, প্রত্যেক গানের শেষেই থাকে মিলন— আসলে রাধা-কৃষ্ণ যে পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন অবয়ব, এই মিলনে তারই ইঙ্গিত দেয়। প্রেম উন্মাদিনী রাধা শ্যাম-সান্নিধ্য অনুভব করেন নিজের কালো কেশের মধ্যে— ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের নীলরঙের মধ্যে। তাই চণ্ডীদাস পদাবলীতে বলেছেন—

'এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথুনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি,
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দু' হাত তুলি

এক দিঠ করি ময়ুর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরিখনে,
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥'…

রাধিকার এই যে মিলন ইচ্ছা, এ শ্রীরাধার ভক্তিরই অনুপ্রেরণা। যদিও পদটি পূর্বরাগের, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগ থেকেই যোগিনী হয়ে বসেছেন আর শেষ পর্যন্ত মিলনেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই পদেই।

এরপর চৈতন্যযুগে কীর্তন এল নতুন রূপে, নতুন রস, ভাব ও ছন্দ নিয়ে। চৈতন্যযুগে কীর্তনের পদে রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের রূপটি ফুটে ওঠে।

চৈতন্য-পরবর্তী কালের কবিরা রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যরূপ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই রূপটি পদের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। চৈতন্যযুগ থেকে 'নাম-সংকীর্তন' ও 'নগর-সংকীর্তনে'র আবির্ভাব হয় এবং নগর-কীর্তন দ্বারা সাধারণ মানুষও বিশেষ প্রভাবিত হয়েছে। নগর-সংকীর্তনের প্রবর্তক হিসাবে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কীর্তন হচ্ছে ভাব ও রসযুক্ত সংগীত, যা মানুষের মনকে বিশেষ একটি স্থানে নিয়ে পৌঁছে দেয়। কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদেব কীর্তন গাইতে গাইতে ভাবে বিভোর হয়ে ব্যহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়তেন।

মধ্যে কীর্তন গানের বহুল প্রচার ছিল না— কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে কীর্তন গানের প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ভগবৎ ভাব সম্বলিত সংগীত বাংলাদেশের গর্বের বস্তু— এ সংগীত আমাদের সংগীত-ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ।

বিভিন্ন রসের সংজ্ঞা

পূর্বরাগ— 'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥'

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী পূর্বরাগ সম্পর্কে উপরিউক্ত সংজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন। শ্লোকটির অর্থ এই যে, সঙ্গমের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা যে রতি উৎপন্ন হয় এবং যা নায়ক-নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে তাকে পূর্বরাগ বলে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ রাধাকে স্বচক্ষে দেখেই জন্মেছিল আর শ্রীরাধার পূবরাগ জন্মেছিল শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার

পূর্বেই শ্রীরাধার পূর্বরাগ জন্মেছিল আর তা ছাড়া নানাভাবে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়, যেমন— দূতী মুখে শ্রবণে, গীতাদি শ্রবণে, সাক্ষাৎ দর্শনে ও চিত্রপট দর্শনে ইত্যাদি। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ পর্যায়ের পদে কবি বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন এবং শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ের পদে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। তবে পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধার পূর্বরাগেরই প্রাধান্য, অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদের সংখ্যাও কম নয়।

শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদ— 'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।
আকুল করিল মোর প্রাণ'...। (চণ্ডীদাস)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ— 'গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি
চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক
দহই অঙ্গ মোর।'... (বিদ্যাপতি)

অভিসার— নায়কের উদ্দেশ্যে মন্মথ মোহিতা নায়িকার যে প্রেমময় যাত্রা তাকে অভিসার বলে। অভিসারে নায়িকা হন সাহসিকা ও আত্মবিস্মৃতা। অভিসারে যাত্রার প্রস্তুতি পর্ব রাধা অতি যত্ন সহকারে সম্পন্ন করেন। অভিসার যাত্রায় জাগতিক লজ্জা, সংকোচ হয় পরাভূত আর প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্ন হয় উপেক্ষিত। গোবিন্দদাস তাঁর অভিসার পর্যায়ের পদে রাধার কৃচ্ছ্রসাধনের রূপটি খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কথিত আছে অভিসারের পদে গোবিন্দদাস সিদ্ধহস্ত, তবে বিদ্যাপতিও অভিসারের বহু সুন্দর পদ রচনা করেছেন।

অভিসারের পদ— 'কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাপি
গাগরী বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥'... (গোবিন্দদাস)

অথবা— 'জলধর অম্বর রুচি পহিরাউলি
সেত সারদ কর বাম।'... (বিদ্যাপতি)

মান— মান সম্পর্কে 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলা হয়েছে—

'স্নেহস্তূৎকৃষ্ঠতা ব্যাপ্তা মাধুর্যং মানয়ন্নবম্
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে॥'

অর্থাৎ— উৎকর্ষ লাভ করে যে স্নেহ নতুন মাধুর্য অনুভব করায় তাকে 'মান' বলে। যেখানে প্রণয়, সেখানেই 'মান'। কখনও স্নেহ থেকে 'মান' উৎপন্ন হয়ে প্রণয় হয়, আবার স্নেহ থেকে প্রণয় উৎপন্ন হয়ে 'মান' হয়। মান দুই প্রকারের— (১) সহেতু, (২) নির্হেতু।

মান পর্যায়ের পদ— 'পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে

পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে।'... (জ্ঞানদাস)

প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ—প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়েও গভীর ও ঐকান্তিক প্রেমের জন্য তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের ভয়ে মনে যে ব্যাকুলতা হয় তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। এ বিষয়ে 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে বলা হয়েছে—

'প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥'

গোবিন্দদাস রচিত প্রেমবৈচিত্ত্যের একটি পদ এখানে দেওয়া হল—

'রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলুঁ রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥
মূরছলি নাগর মূরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কূল না পাই॥'...

মাথুর— শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন হেতু বৃন্দাবনবাসীদের যে বিরহ তাকে 'মাথুর' বলে। অক্রূর যখন কংস নিধনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যাবার জন্য বৃন্দাবনে পদার্পণ করলেন তখন বৃন্দাবনবাসীরা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং শ্রীরাধাও অক্রূরকে দোষারোপ করে বলেন—

'নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যো সম
সো আওল ব্রজ-মাঝ।'... (গোবিন্দদাস)

এখানে রাধা বলছেন নামে অক্রূর হলেও এর মতো ক্রূর আর নেই, তাই সে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। মাথুরের পদে বিদ্যাপতি সিদ্ধহস্ত বলে কথিত আছে। এখানে বিদ্যাপতির একটি পদ উল্লেখ করা হল—

'চির চন্দন উরে হার না দেলা
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা।'...

বিদ্যাপতি মাথুরের পদ রচনায় যে করুণ রসের সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা হয় না।

ভাবোল্লাস বা ভাব-সম্মেলন—দীর্ঘ বিরহের পর যখন নায়িকা নায়কের সঙ্গে মিলনের জন্য অধীর হয়ে ওঠে, মন আর প্রবোধ মানে না, বিরহ অসহ্য হয়ে ওঠে— তখন শ্রীরাধা অন্তরে মিলন সুখ অনুভব করেন। এইরূপ অবস্থায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণধ্যানে তন্ময় হয়ে ভাবরাজ্যে যেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। এই মিলনের নাম ভাব-সম্মেলন। ভাব-সম্মেলনের একটি বিখ্যাত পদ—

'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দ।'… (বিদ্যাপতি)

পাঁচালী

পাঁচালীর কথা বলতে গেলে সর্বাগ্রে স্বীকার করতে হয় যে, বাংলাদেশে ব্রত-কথা পাঁচালী বহুদিন থেকে প্রচলিত। প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালীর কথা। রামের জীবন কাহিনী অবলম্বনে পয়ার ছন্দে লেখা এই পাঁচালী কথা। পূর্বে বৃদ্ধারা অবসর সময়ে সকলে একত্র হয়ে পাঁচালী কথা শুনতেন। একজন সুন্দর সুর করে পড়তেন, অপর সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। এক এক দেব-দেবীকে আশ্রয় করে এই পাঁচালী কথা রচিত হয়েছিল।

বাড়ীর মেয়েরা লক্ষ্মীদেবীর বর লাভ করবার জন্য লক্ষ্মীর পাঁচালী কথা সুর করে পড়তেন। এ সব পাঁচালীর মধ্যে প্রায়ই অলৌকিক কাহিনী বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে লক্ষ্মীদেবীর বরে সদাগরের সপ্তডিঙ্গা যা ডুবে গিয়েছিল তা আবার জলে ভেসে উঠেছিল— সদাগর তার হারানো সব কিছু ফিরে পেয়েছিল লক্ষ্মীর বরে।

কুমারী মেয়েরা মাঘমণ্ডল ব্রতের পাঁচালী পড়ত। মাঘমণ্ডলের ব্রত-কথায় সূর্যকে দেবতা কল্পনা করা হয়েছে এবং ঐ উপলক্ষ্যে সূর্যের পাঁচালী গীত হত। বাড়ীর মেয়েরা গ্রহশান্তির জন্য শনির পাঁচালী ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ করতেন বিশেষ তিথিতে। বৈশাখ মাসে মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত-কথা পাঠ করার রীতি আছে—তাতে বাড়ীর অমঙ্গল দূর হয়। প্রবাদ আছে মা চণ্ডীর

কৃপায় বিষের নাড়ুও অমৃত হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া মনসার ভাসানেও পাঁচালী গান গীত হত। প্রবাদ আছে মনসার বরে লক্ষিন্দর ও তার সব ভাইয়েরা বেঁচে উঠেছিল এবং চাঁদবেণের ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়াও ইতু পূজা, পুণ্যি পুকুর, যম পুকুর এসব ব্রত-কথাও মেয়ে মহলে প্রচলিত ছিল।

পাঁচালীর সুরটি খুব মিষ্টি এবং একই সুরে গাওয়া হয়ে থাকে আর এর একটা বিশেষ ছন্দ আছে। মাঝে এ সব ব্রত-পাঁচালী লুপ্ত হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা আবার নিজ মর্যাদা কতকাংশে পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছে। এ যুগেও প্রায় সব মেয়েরাই লক্ষ্মীর পাঁচালী, চণ্ডী পাঁচালী, শনির পাঁচালী ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী কথা পড়ে থাকেন। বাড়ীর বৃদ্ধারা আজও রামায়ণ পাঁচালী পড়েন। এ সব ব্রত-পাঁচালী কথা আমাদের দেশের নিজস্ব সম্পদ।

শাক্ত সংগীত ও বৈষ্ণব গানের তুলনা

শাক্তগীতি ও বৈষ্ণবগীতি এই দুই শ্রেণীর গীতই রচনা করে গেছেন ভক্ত কবিদল। ভক্তিকে আশ্রয় করে এই উভয় কাব্য গড়ে উঠেছে। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব শাক্ত পদাবলীর বহু আগে। এইজন্য শাক্ত পদাবলীর মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্তিরসের আধিক্য দেখা যায়নি, তবে চৈতন্যের আবির্ভাবের পরই বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্তিরসের বন্যা বয়ে গেছে।

বৈষ্ণব সাধক দেবতার কোমলকান্ত রূপমূর্তির ধ্যান করেছেন আর শক্তি সাধকেরা কালিকার মাধুর্য স্বরূপটি চাক্ষুষ করেছেন। তবে বৈষ্ণব কবিতায় ভাব বৈচিত্র্য ও কল্পনার অবাধ বিস্তার শাক্ত পদাবলীতে নেই। শাক্ত কবিরা বহু বিচিত্র ভাবরাজ্যে সঞ্চরণ করেননি। দুই শ্রেণীর পদাবলীই ভক্তি রসাশ্রিত, তবে শাক্ত ভক্তি ও বৈষ্ণব ভক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক।

শাক্তের সাধনা মাতৃভাবের আর বৈষ্ণবের সাধনা কান্তাভাবের। শ্যামা-সংগীতের কবিরা উপাস্য দেবতাকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। বৈষ্ণবের 'মধুর' রসের সাধনায় ঈশ্বর পরম প্রণয়াস্পদ আর রাধা এই পরমাত্মিত্বের

প্রণয়াস্পদা (কান্তা)। বৈষ্ণব সাধক প্রেমের পথেই ঈশ্বরকে সন্ধান করেছেন। শাক্ত কাব্যের প্রাণকেন্দ্রে 'জননী' আর বৈষ্ণব কাব্যের মর্মকেন্দ্রে 'প্রেয়সী' বিরাজমানা। উভয় শ্রেণীর পদাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হল বৈষ্ণব কবির মধ্যে ঐশ্বর্যবুদ্ধির স্পর্শ নেই, আর শাক্ত কবির ভক্তি ঐশ্বর্যমিশ্রা।

এরপর আমরা তৃতীয় পার্থক্য দেখতে পাই রসের ক্ষেত্রে। বৈষ্ণব কাব্যে পাঁচটি রসের উল্লেখ আছে, যেমন— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শাক্তের ভক্তিধারা থেকে যে কয়টি রস নিঃসৃত হয়েছে তা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যেমন— বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত। বৈষ্ণব সাধকের কাছে তার পরমারাধ্য কোথাও প্রভু, কোথাও সখা এবং কোথাও প্রিয়তম ; আর শাক্ত সাধকের কাছে তার পরমারাধ্যা কোথাও মাতা, কোথাও বা কন্যা। উভয়ের সাধনরীতি কয়েকটি কারণে পৃথক হয়ে পড়েছে। শান্তরস বৈষ্ণব সাধনার প্রাথমিক অবস্থা, কিন্তু শাক্ত সাধনায় এই রসটি পরিণত অবস্থা অর্থাৎ শেষ অবস্থা।

চতুর্থ পার্থক্য হল বৈষ্ণব সাধনায় প্রতীকের স্থান রয়েছে, কিন্তু শাক্ত সাধনায় প্রতীকের স্থান নেই। সেখানে মা ও পুত্র— ভগবান আর ভক্ত— মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উভয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্ক। এতে কোনও মধ্যস্থতা নেই।

আর বৈষ্ণব সাধনায় শ্রীরাধার মহাভাব একটি মাধ্যম— এই মহাভাবে ভাবিত যে হবে সে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে— এ হচ্ছে বৈষ্ণব সাধকদের কথা। এই কারণে উভয়ের কাব্যের আবেদনেরও পার্থক্য আছে।

বৈষ্ণব কাব্যের রস যথার্থ উপলব্ধি করতে হলে বৈষ্ণব সাধন তন্ত্রের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শাক্তের রচিত মাতৃভাবের কবিতা সাধারণে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সব শেষে কাব্যকলার কথা উল্লেখ্য।

শাক্ত পদাবলীর মধ্যে কলা-সৌন্দর্য তেমন লক্ষ্য করা যায় না, যেমনটা বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতিমান পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন— সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ পরিচয় ছিল। কাব্য রচনা করতে বসে বৈষ্ণব কবিরা এই পরিচিতির সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন। এ কথা শাক্ত কবিদের ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজ্য নয়। কাব্যকলার দিক্ দিয়ে শাক্ত কবিতায় সূক্ষ্ম শিল্পকার্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ছন্দ, অলংকার ও বাণী বিন্যাসের পারিপাট্যে বৈষ্ণব কবিতা এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি জয়দেবের একটি পদ উল্লেখ্য—

'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।'...

এখানে কবি জয়দেব উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ পদটি ছন্দ, অলংকার ও শব্দের চূর্ণঝঙ্কারে এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে, তবে সাধারণের পক্ষে এর রস আস্বাদন করা খুব সহজ নয়।

অপর দিকে শাক্ত কবিতার মধ্যে ছন্দ-বৈচিত্র্য নেই, অলংকারের সমৃদ্ধি নেই এবং বাণীর পারিপাট্য নেই। এখানে আছে সহজ সরল আবেদন— এ যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মায়ে পোয়ে কথা বলা। এ জন্য শাক্ত পদ উপভোগ করবার জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির তেমন প্রয়োজন হয় না, ভক্তিযুক্ত পাঠক মাত্রই এ কাব্যের রস আস্বাদন করতে সক্ষম হন। রামপ্রসাদের একটি পদ এখানে উল্লেখ করা হল—

'কুপুত্র অনেক হয় মা
কুমাতা নয় কখনও,
রামপ্রসাদের এই আশা মা
অন্তে থাকি পদানত।'

এই পদটির মধ্যে আছে রামপ্রসাদের সহজ সরল আবেদন—আর এ আবেদন সাধারণের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টসাধ্য নয়—এ সহজবোধ্য।

তবে শাক্ত পদাবলীতে কাব্য-প্রকাশের নতুন ভঙ্গী আমরা দেখতে পাই, তার কারণ অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালীর সমাজ জীবনের বিরাট পরিবর্তন। প্রত্যেক যুগের সাহিত্যে ও কাব্যে সে যুগের সমাজ জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্য-পরবর্তী কালের পদাবলী লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যুগের প্রভাব কতটা শক্তিশালী। প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলীতে সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, আবার চৈতন্য-পরবর্তী যুগের পদাবলীর মধ্যে সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। চৈতন্য আবির্ভাবের ফলে চৈতন্য-পরবর্তী কালের পদাবলীর মধ্যে ভক্তির বন্যা বয়ে গেছে। শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব বৈষ্ণব পদাবলীর বহু পরে।

শাক্ত পদাবলীতে কাব্য-সৌন্দর্য তেমন পরিলক্ষিত হয় না— সেখানে পদাবলী হয়েছে ভক্তিরসে সিঞ্চিত।

সাধক কবি রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ সেন— শ্রীরামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলী সাহিত্যের প্রবর্তক এবং শাক্ত পদাবলীতে তাঁর একটা বিশেষ স্থান আছে। কথিত আছে দৈবী কৃপা লাভ করে তাঁর কণ্ঠ থেকে অজস্র সংগীত উৎসারিত হয়েছে। ঐ সমস্ত সংগীতের কিছু অংশ লিপিবদ্ধ হয়ে 'প্রসাদী সংগীত' নামে খ্যাতি লাভ করেছে। তিনি যে সমস্ত আগমনী ও বিজয়ার গান রচনা করে গেছেন তার মধ্যে সেকালের পারিবারিক জীবনের ছবি এমন প্রত্যক্ষগোচর আর তার মধ্যে একটা মানবিক আবেদন এমন সুন্দর ফুটে উঠেছে, যা মানুষকে ব্যথাতুর করে তোলে ও তার ফলে চোখ জলে ভরে আসে।

রামপ্রসাদের পূর্বে অনেক মহাপুরুষ তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু রামপ্রসাদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য অনেক। কারণ এর পূর্বের সাধকগণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তার ফলকে হয় গোপন রাখতেন, নয় ত সংস্কৃতের বন্ধনে তাকে বেঁধে পাঠকদের আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। সকলের পক্ষে সংস্কৃত সহজবোধ্য ছিল না।

রামপ্রসাদ কিন্তু তাঁর উপলব্ধিকে ও অনুভূতিকে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন— তাঁর এই অকৃপণ দানে বাংলাদেশ ধন্য হয়েছে।

রামপ্রসাদের গানের মতো এত সহজ সরল আবেদন অপর কোন কবির গানে স্পষ্ট হয়নি। রামপ্রসাদ একাধারে ভক্তসাধক ও কবি। তাঁর ভক্তির সম্যক্ প্রকাশ তাঁর শ্যামাসংগীতগুলির মধ্যে— এক কথায় বলা যায় রামপ্রসাদ 'শাক্ত তরঙ্গিণী গো-মুখী'।

১৭২০ খ্রীস্টাব্দে হালিসহরের কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈশবে মাতৃহীন হন। তাঁর বিমাতা ছিল। রামপ্রসাদ ছিলেন গৃহী সাধক— স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে তাঁর সংসার।

এই পরিবারের আত্মীয়েরা শুধু যে তাঁর বন্ধনই ছিল তা নয়, তাঁদের

প্রতি তাঁর অজস্র স্নেহ তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া কবিতার মধ্যে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক জীবনের বহু কথা ব্যক্ত হয়েছে। জীবনের বহু ছোটখাট অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তবে এই পার্থিব বন্ধনের মধ্য দিয়েই তিনি মায়ের বন্ধনের রূপটি খুঁজে পেয়েছেন। এই জগৎমাতার ধ্যানে মনকে সহস্রার পদ্মে নিবিষ্ট করেও তিনি সংসারকে ভুলে যাননি। এই বাস্তব সুখ-দুঃখের ছবি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে বৈচিত্র্য এনেছে। তাঁর নিজের জীবনের গ্লানি, দারিদ্র্যের বাস্তব অনুভূতি তাঁর গানে করুণ সুর তুলেছে। মায়ের স্নেহ, সন্তানের আর্তি, নিষ্পেষিত জীবনের আর্তনাদ রাপ্রসাদের কবিতায় যেমন করে করুণ সুরের ঢেউ তুলেছে এমন আর কোন শাক্ত সাধকের মধ্যে দেখা যায় না। রামপ্রসাদ জীবনপ্রেমিক হয়েও নিরাসক্ত। গৃহী হয়েও ত্যাগী— তিনি ভোগী অথচ যোগী। এই সমস্ত মিলেই রামপ্রসাদের তন্ত্রসাধনা কাব্যসাধনায় রূপ নিয়েছে।

রামপ্রসাদ 'কালিকামঙ্গল' রচনা করে দেওয়ান রাজকিশোরের কাছ থেকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন। এই কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিত্ব ও সাধকতা দুইই প্রকাশ পেয়েছে। তান্ত্রিক শব-সাধনার কথা তাঁর পূর্বে অপর কেহ কাব্যে প্রকাশ করেননি— তিনিই এই কাজে সাহসী হয়েছিলেন।

রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলীতে অতি সুন্দর ভাবে দিব্যভাবের কথা বলা হয়েছে। রাজসিক স্তর অতিক্রম করে ভক্ত এখানে সাত্ত্বিক স্তরে উপনীত হয়েছেন। রাজসিক ভাবে অনাস্থা আর স্থূলের প্রতি বিরক্তি এই স্তরের শেষ কথা।

রামপ্রসাদ বলেছেন— 'মন তোর এত ভাবনা কেনে
একবার কালী বলে বস্ রে ধ্যানে ॥'···

রামপ্রসাদ 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেছিলেন অপরের আদেশে, কিন্তু শ্যামা-সংগীত রচনা করেন নিজের হৃদয়ের আবেগে, নিজের প্রাণের তাগিদে। সেই জন্য অন্তরের অন্তঃস্থলের আকূতি প্রকাশ পেয়েছে এই গানে। এ যেন মায়ের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মনে মনে কথা বলা, সন্তান যেমন মায়ের কাছে তার দুঃখের সব কথা বলে, তেমনই রামপ্রসাদও এখানে জগৎজননী মা কালীর কাছে সব কথা বলেছেন। এইজন্য রামপ্রসাদের গানগুলি একান্তভাবে আত্মভাষণ। এইগুলি আবেগে, আবেদনে, অনুরাগে, অভিমানে ও আত্মনিবেদনে ভরপুর।

সেই দিক দিয়ে বিচার করলে রামপ্রসাদের গানগুলি গীতিকবিতার চমৎকার নিদর্শন বলা চলে।

রামপ্রসাদের গানে তত্ত্বও আছে। অনেকে হয়ত বলবেন এগুলি সম্প্রদায়-গত অধ্যাত্ম সংগীত, কিন্তু রামপ্রসাদ সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য নয়। রাম-প্রসাদের কবিতাগুলি আস্বাদনের জন্য বিশেষ কৌশল চাই, কারণ রামপ্রসাদের কবি-প্রকৃতি যে সংস্কারের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, সেই সংস্কার ও সেই ধর্মের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে তাঁর কবিতা অর্থহীন, কবিত্বহীন বলে মনে হবে।

একদল সমালোচক বলেন, রামপ্রসাদের ভক্তিপ্রগাঢ়তা বেদান্ত আগমের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ, আবার কোন কোন সমালোচক রামপ্রসাদের সংগীতাবলীর মধ্যে বৈষ্ণব বিদ্বেষ আছে বলে মনে করেন। কিন্তু এ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। যে সমস্ত সাধক সাধনার চরম স্তরে পৌঁচেছেন তাঁদের কাছে শৈব, বৈষ্ণব সব একাকার হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সাধক সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির অতীত হয়ে বলে ওঠেন— 'কালী হলি মা রাসবিহারী

নটবর বেশে বৃন্দাবনে।'…

রামপ্রসাদের গানে এক পরম উদারতার আভাস দেখা যায়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বশে নয়, সাধকের মতোই রামপ্রসাদ কালীর কালো রূপকে কীর্তন করেছেন। রামপ্রসাদের গানে বিদ্বেষ নেই, প্রচারের কোন আগ্রহ নেই। উদার মনে বিশ্বভুবনের দিকে তাকিয়ে তিনি সব শ্যামাময় দেখেছেন। ষড়-দর্শনে যার দর্শন পাওয়া যায় না, প্রগাঢ় ভক্তির প্রাবল্যে তিনি তাঁর দেহস্থ ষট্চক্রে তাঁকে আপন করে পেয়েছেন। মা-পাগল সন্তানের মতো তিনি মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন— তাঁর কাছে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করেছেন। সাধন শক্তিতে বলীয়ান সাধক আনন্দে বিভোর হয়ে শক্তিময়ীর সম্মুখে উদ্ধত সন্তানের মতো তেজ দেখিয়েছেন— সেই হল প্রসাদী সংগীত। প্রসাদী সংগীত মানে মায়ের প্রসাদে পবিত্র, নির্মল সরলতা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ ভক্তিসংগীত।

রামপ্রসাদের কৃপায়ই নিপীড়িত মানব মাতৃচরণে তাঁর বেদনা নিবেদন করবার মতো ভাষা খুঁজে পেয়েছে। রামপ্রসাদের সাধনায় যেন দেশবাসীর দেহাভ্যন্তরস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জেগে উঠেছে। তাই কবি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন—

'ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।'

এই অপূর্ব সংগীত আজ বাংলার একান্ত আদরের জিনিস। এই রূপে ভক্ত সাধক বহু সংগীত রচনা করে গেছেন। তিনি শুধু রসস্রষ্টা কবি নন— তিনি অভয় দাতা আচার্যও বটেন। রামপ্রসাদের 'প্রসাদী' সংগীত আজ বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এবং এ সংগীত আমাদের সংগীত-ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ।

সাধক কবি কমলাকান্ত

কমলাকান্ত ভাট্টাচার্য— রামপ্রসাদ সেনের পরই আর একজন বিখ্যাত শাক্তগীতিকার কবি কমলাকান্ত। তিনি উচ্চস্তরের কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁর জন্ম কালনা গ্রামে। বর্ধমানের মহারাজ তেজসচন্দ্র কমলাকান্তের সাধন গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে সভাকবি করে নিয়েছিলেন। কারও মতে ইনি তেজসচন্দ্রের গুরু ছিলেন— আবার কারও মতে ইনি তেজসচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কবি কালনা থেকে বর্ধমান আসেন এবং বর্ধমানের নিকটে কোটালি নামক স্থানে তাঁর জন্য গৃহ নির্মিত হয়। সাধক সেখানে মাতৃমূর্তি স্থাপন করে পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসে সাধনা করতেন বলে কথিত আছে। ঐ সময়ে শোনা যায় বর্ধমানের রাজমহিষীর পুত্র প্রতাপচাঁদ কমলাকান্তের বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েন। শাক্তগীত রচনায় রামপ্রসাদের পরই কমলাকান্তের স্থান। শ্যামামায়ের প্রতি অনন্যসাধারণ ভক্তি ও আত্মনিবেদনের ভঙ্গীতে কমলাকান্তের পদগুলি আদরের সামগ্রী। কমলাকান্তের সংগীতে যে স্নেহ, যে আব্দার, যে মান-অভিমানের সুর বেজেছে তা যে কোন মানুষের মনেই রেখাপাত করে।

শোনা যায় কমলাকান্ত তাঁর সংগীতের দ্বারা দস্যুদের মনকেও আকর্ষণ করেছিলেন। রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্তের তুলনা করলে দেখা যায় যে, একজন ভাবতন্ময় আত্মহারা, আর অন্যজন সচেতন শিল্পী। রামপ্রসাদ সরল অনাড়ম্বর— তাঁর ভাবপ্রকাশে কোন রূপ বাক্‌চাতুরী নেই, আছে ভক্তের আত্মহারা ভাবতন্ময়তা। আর কমলাকান্তের মধ্যে পাই ভক্তিভাবের মধ্যেও শিল্পীর আত্মসচেতনতা। তবে তার মধ্যেও বিচার আছে, সংযম বোধ আছে, তাই তাঁর পদের ছন্দমাধুরীতে শ্রুতিমধুর শব্দঝংকারের প্রতি সহজ দৃষ্টি।

'মজিল মন ভোমরা কালীপদ নীলকমলে' এই পদটিতে মাতৃচরণ রূপ কমলের মধুপানের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সন্তান বলে মায়ের উপর তাঁর জোর-জবরদস্তি অন্যপ্রকারের; শক্তির নিকট তাঁর যে আত্মসমর্পণ, সে শক্তি যেন তাঁর হাতের মুঠোয়, তাই মায়ে-পোয়ে বাদবিসম্বাদ, এত চোখরাঙানি।

কমলাকান্তের কাব্যে স্নেহের লুকোচুরি খেলা আছে, কিন্তু তা উদ্দাম নয়। তাঁর সংগীত অনেকাংশে প্রশান্ত, তাতে বৈষ্ণবোচিত কোমলতা মাখানো রয়েছে তাঁর অনুযোগের মধ্যে—

'জানি জানি গো জননী
যেন পাষাণের মেয়ে
আমারি অন্তরে থাকো মা
আমারে লুকায়ে'...।

কমলাকান্তের শাক্ত সংগীতে বৈষ্ণব ভাব বেশী, কিন্তু রামপ্রসাদে বৈষ্ণব ভাব কম। শক্তিসাধনার দিক্ থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। রামপ্রসাদ সিদ্ধির যে স্তরে উঠেছিলেন, কমলাকান্ত সেই স্তরে উঠতে পারেননি। রামপ্রসাদ মাতৃসাধনার সুউচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলেই—

'এবার কালী তোমায় খাব'।...

বলে স্পর্ধিত ভঙ্গী প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কমলাকান্তের শাক্তগীতিতে এরূপ স্পর্ধা নেই। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, কমলাকান্তের শাক্তগীতিও আজ বাংলার ঘরে ঘরে রণিত হচ্ছে এবং এ সংগীতও আমাদের সংগীত-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

রামনিধি গুপ্ত

রামনিধি গুপ্ত— নিধুবাবু নামে সর্বত্র পরিচিত। এঁর জন্ম ১১৪৮ বঙ্গাব্দে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নিধুবাবুর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইনি বাংলা টপ্পা গানের একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। সে সময়ে কলিকাতার নানা অঞ্চলে মার্গ সংগীতের বৈঠক বসত। অনেকেই বহু যত্ন করে উত্তর ভারতীয় ওস্তাদি গান শিখতেন। আবার কেউ বা হিন্দীগানকে ভেঙে বাংলা গান তৈরি করে গাইতেন। এরই নাম বৈঠকী সংগীত বা আখরাই গান।

অর্থাৎ কারও বৈঠকখানায় বা আটচালার আখরায় এসব গানের চর্চা হত।

রামনিধি গুপ্ত বৈঠকী গানের একজন বড় ওস্তাদ ছিলেন। বাংলার বাইরে থেকে তিনি হিন্দী টপ্পা গান শিখে এসে বাংলাদেশে বাংলা টপ্পা গানের প্রচলন করেন। টপ্পা হল হালকা চালের মার্গ সংগীত আর শোরি মিঞা ছিলেন হিন্দুস্থানী টপ্পার প্রধান উদ্ভাবক। টপ্পার ঢঙে অনেকে ভক্তিমূলক গানও গাইত। কোন এক সময়ে এই গানের খুব কদর ছিল এবং নিধুবাবুর টপ্পা গান উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। টপ্পা গানের কথা উঠলেই নিধুবাবুর নাম এসে যায় আর নিধুবাবুর নাম করতে গেলেই টপ্পা গানকে বাদ দেওয়া যায় না।

অধুনা টপ্পা গানের আবার প্রচলন হয়েছে এবং টপ্পার ঢঙে শ্যামাসংগীত পরিবেশন করা হচ্ছে। টপ্পা ঢঙের কীর্তনকে ঢপ কীর্তন বলে। হিন্দী টপ্পা ও বাংলা টপ্পার পার্থক্য এই যে, হিন্দী গানে যে ভাবে সুরের কারুকার্য করা হয় বাংলা টপ্পা গানে ঠিক সে ভাবে করা হয় না, তাতে নিধুবাবুর নিজস্ব একটা ঢং আছে। নিধুবাবু একাধারে সুগায়ক ও সুকবি ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে এত সুন্দর টপ্পা গান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বেশ সহজ সরল ভাষায় বাংলা গান রচনা করে তাতে পাঞ্জাবী টপ্পা গানের রীতি-নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর টপ্পা গানের তুলনা হয় না। নিধুবাবুর টপ্পা গানের গায়ন পদ্ধতি আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। নিধুবাবুর একটি টপ্পা গান—

ঝিঁঝিঁট— জলদ তেতালা

'পিরীতি না জানে সখি সে জন সুখী বল কেমনে
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে॥'…

নিধুবাবুর গানে নানা রাগের সমাবেশ দেখা যায়। যেমন— ঝিঁঝিঁট, সুরট, ইমন, ভূপালী, জয়জয়ন্তী, ললিত, আড়ানা প্রভৃতি এবং অন্যান্য আরও রাগ। তালের মধ্যে কাওয়ালী, ঢিমাতেতালা, আড়াঠেকা, একতালা প্রভৃতি। এ ভাবে নানা রাগ ও তালের সমাবেশে নিধুবাবুর টপ্পা গান বাংলা গানের জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কীর্তনে যেমন টপ্পার ঢং ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথও তাঁর বহু গানে টপ্পার ঢং ব্যবহার করেছেন। টপ্পা বাংলা সংগীতের একটি বিশেষ ধারা। উত্তর ভারতীয় টপ্পার সঙ্গে বাংলা টপ্পা গানকে এক করে দেখবার উপায় নেই। বাংলা টপ্পা বাঙ্গালীর সাংগীতিক

প্রতিভার স্বকীয় জারক রসে জারিত হয়ে উত্তর ভারতীয় টপ্পার ধাঁচ-ধরন থেকে একটা স্বতন্ত্র মূর্তি লাভ করেছে। নিধুবাবুর জন্যই মূলত বাংলা টপ্পার এই বৈশিষ্ট্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

দাশরথি রায়

দাশরথি রায় ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার বাঁধমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অসচ্ছলতার জন্য তিনি মাতুলালয়ে লালিত হয়েছিলেন। দাশুবাবু ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও এক নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোককে কবির দলের গান রচয়িতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পরে মাতার অনুরোধে ঐ কবির দল ছেড়ে দিয়ে পাঁচালী রচনা শুরু করেন। পাঁচালী রচয়িতা হিসাবে দাশরথি রায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মধ্যযুগের বিবৃতিমূলক কাব্য-কাহিনীকে পাঁচালী-প্রবন্ধ বলা হত। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অনুবাদ পাঁচালী হিসাবে গ্রহণ করা হত, তবে অষ্টাদশ শতকের দাশরথি রায়ের পাঁচালী ভিন্ন ধরনের। তিনি আধুনিক ধরনের পাঁচালী রচনা করে সে যুগে কলিকাতা অঞ্চলে যথেষ্ট নাম কিনেছিলেন। পূর্বকালের পাঁচালীতে সুর ছিল পৌরাণিক আর রচনার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল ভক্তি ও বিশ্বাস। কিন্তু দাশু রায়ের মতো পাঁচালীকারেরা দেব-দেবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও আধুনিক সমাজ সম্পর্কিত ঘটনা ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের দিকেই ঝোঁক দিতেন বেশী।

তিনি শব্দ-কবি বলে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর রচনায় শব্দালংকারের প্রাচুর্য, বিশেষ করে অনুপ্রাস ও যমকের ছড়াছড়ি ছিল। তবে ভাবের দিক্ দিয়ে দাশরথি কাব্যকে সুন্দর করে তুলতে পারেননি, এর জন্য দায়ী তাঁর কাব্যের অশ্লীলতা ও কৌতুকরস। তবে এই অশ্লীলতা তৎকালীন সমাজের রুচির পরিপোষক ছিল। পৌরাণিক বিষয় ছাড়াও তিনি সেকালের সমাজের সামাজিক খুঁটিনাটি নিয়েও অনেক পদ রচনা করেছেন। শ্যামাসংগীত রচনায় দাশু রায়ের কৃতিত্ব আছে— সেখানে তিনি যেন হঠাৎ ধর্মগম্ভীর হয়ে গানগুলিতে এক আশ্চর্য বৈরাগ্য ও ভক্তিপ্লুত কাতরতা ঢেলে দিয়েছেন। এই জন্য দাশরথি রায়ের শ্যামাসংগীত এত মর্মস্পর্শী হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দাশরথি রায়ের গানের দুটি লাইন উদ্ধৃত করা হল—

'মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি,
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী কালী'…।

দাশরথি রায় আরাধ্যা দেবীর নাম করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান, সে কথাই ব্যক্ত করেছেন এই পদটির মধ্যে। এখানে কবির অন্তঃস্পর্শী আবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা কি না কেবলমাত্র ভক্ত সাধকের দ্বারাই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। দাশরথি রায়ের শ্যামাসংগীত মানুষের মনকে স্পর্শ করে—এ শ্যামাসংগীত আজও জনসমাদৃত এবং এ শ্যামাসংগীত আমাদের সংগীত-ভাণ্ডারের এক সম্পদ। বাংলা গানের বিবর্তনের ইতিহাসে দাশু রায়ের রচনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

গম্ভীরা

গম্ভীরা একটি বিশেষ ধরনের লোকসংগীত। শিবের গাজন উপলক্ষ্যে এই গান গাওয়া হয়। নীল উৎসবেরও একটি অঙ্গ হচ্ছে গম্ভীরা। নীলপূজার প্রথম দিনে হয় গম্ভীরা উৎসব। স্থান বিশেষে গম্ভীরা উৎসবের বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। গম্ভীরাকে কোথাও গাজন, কোথাও সাহী যাত্রা, আবার কোথাও নীলোৎসব নামে অভিহিত করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জায়গাতেই এই গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে স্থান ভেদে বিভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়।

গম্ভীরা মালদহ জেলার নিজস্ব লোকসংগীত। মালদহে গম্ভীরা উৎসবে মণ্ডপের সাজসজ্জা অন্যান্য স্থানের উৎসবের সাজসজ্জা থেকে পৃথক। এ উৎসব উপলক্ষ্যে পূজাগৃহ ভিন্ন নৃত্যমণ্ডপও স্থাপিত হয়। নৃত্যসহযোগে এই গম্ভীরা গান গীত হয়ে থাকে। গম্ভীরা গানের নির্দিষ্ট কোন রাগ, তাল বা সুরের সন্ধান মেলে না, তবে বর্তমান দিনে শিল্পীরা প্রাচীন সংগীতভিত্তিক সুরারোপ করে থাকেন আর তাতে রাগের সন্ধানও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

এই গানের বিষয়বস্তু বাস্তব জীবনের দুঃখ বেদনা নিয়ে রচিত। গম্ভীরা গানের একটি নমুনা এখানে দেওয়া হল—

'প্যাটেতে ভাত নাই ও শিব গোলাতে নাই ধান,
কি দিয়া বাচাব ও শিব ছেলেপিলার জান
ও বুড়া শিব দয়া কর…'।

এখানে পার্বতী দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, পেটে ভাত নেই আর গোলাতে ধান নেই কাজেই ছেলেপিলেদের কি করে বাঁচাবেন তিনি।

এই গানের গম্ভীরা নামকরণের একটা কারণ আছে। আদিযুগে দেবগৃহ মাত্রেরই গম্ভীরা নাম ছিল, এমন কি 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেও গম্ভীরা অর্থে দেবগৃহকেই বলা হয়েছে। আবার 'গম্ভীরা' শব্দে পদ্মকেও বোঝায়। শিবের একটি নামও 'গম্ভীর', কাজেই শিবকে উপলক্ষ করে যে-উৎসব, তার নামকরণের সূত্রেই হয়ত এই নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকবে।

বাংলা লোকসংগীতের এটি একটি বিশেষ ধারা— এ গানের মধ্যে বাঙ্গালী জীবনের বিশেষ একটা আবেদন আছে। মধ্যে এ গান লুপ্তপ্রায় হয়ে গেলেও আবার এ গানের প্রচার শুরু হয়েছে। বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে এখন প্রায় প্রতি বছর এ গানের আসর বসে।

ঝুমুর

ঝুমুর গান লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতালদের মধ্যে এই গানের প্রচলন বেশী। দলবদ্ধভাবে এই সংগীত পরিবেশন করে সাঁওতালরা। গানের সঙ্গে মাদল বাজে, আর যারা গায়ক তাদের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা থাকে এবং গায়কেরা নেচে নেচে গান পরিবেশন করে। মনে হয় সাঁওতালদের ঐ ঝুমুর গানই পশ্চিমবাংলার লোকসংগীতে স্থান পেয়েছে। পূর্বেকার ঝুমুর গানই বাংলার লোকসংগীতের সঙ্গে মিশে রাধা-কৃষ্ণের লীলা সহযোগে এক নতুন রূপ নিয়েছে। সাঁওতালদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েই এই গানে অংশ গ্রহণ করে। পুরুষ একজন মাদল বাজায় এবং অপর গায়কেরা সারি বেঁধে গোল হয়ে দাঁড়ায়— পায়ে থাকে ঘুঙুর আর নেচে নেচে গান গেয়ে থাকে। গানের তালও খুব সুন্দর আর রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। ঝুমুর গানের তাল দ্রুত। সুরের কারুকার্যের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। অধুনা ঝুমুর গানের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে— এখন এ গান এককও গাওয়া হয়ে থাকে।

আধুনিক যুগে কবি নজরুল ইসলাম বহু ঝুমুর গান রচনা করে তাতে সুর সংযোজনা করেছেন। নজরুলের ঝুমুর গানের দুটি লাইন উদ্ধৃত করা হল—

'নিম ফুলের মৌ পিয়ে
ঝিম হয়েছে ভোম্‌রা ঝিম্ হয়েছে ভোম্‌রা।'...

এখানে কবি ভ্রমরের নিম ফুলের মৌ পানের কথা ব্যক্ত করেছেন। আধুনিক যুগের আর একটি গান—

'লাল নটের ক্ষেতে কে লাল নটের ক্ষেতে
লাল টুক্‌টুকে বৌ যায় গো।'...

এখানে কবি লাল নটে ক্ষেতের মধ্যে কল্পনায় লাল টুক্‌টুকে বৌকে যেতে দেখছেন। নটে গাছের রং লাল, আর নটের ক্ষেতে সবই লাল দেখা যাচ্ছে—এক সঙ্গে নটেগাছগুলি যখন হাওয়ায় দুলতে থাকে তখন কবি তাঁর কল্পনায় দেখেন লাল টুক্‌টুকে একটি বৌ যেন ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলেছে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলে যায়, তাই ঝুমুর গানের বিষয়বস্তুও বদলে গেছে। পূর্বযুগে গানের বিষয়বস্তু হিসাবে রাধা-কৃষ্ণ লীলাকে গ্রহণ করা হত, আর আধুনিক যুগে সাধারণ জিনিসকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে ঝুমুর গান রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। বর্তমানে ঝুমুর গান পশ্চিমবাংলার লোকসংগীতেরই এক দিক্— এ গান বাংলার নিজস্ব সম্পদ।

বাউল গান ও বাউল সাধনা

মধ্যযুগে ঈশ্বর প্রেমে পাগল এবং বাহ্যিক ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তি-মাত্রকেই 'বাউল' বলা হত। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও এই অর্থে 'বাউল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। উপরি-উক্ত গ্রন্থে মহাপ্রভু নিজেকে 'বাউল' বলেছেন। বাতুল বা ব্যাকুল থেকে 'বাউল' কথাটির উদ্ভব হয়েছে অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেমে যারা পাগল তাদেরই 'বাউল' বলা হত।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে একদল রহস্যবাদী সাধক ছিলেন যাঁরা এই বাউল নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা যে সমস্ত অধ্যাত্মসংগীত রচনা করেছিলেন, তা অষ্টাদশ শতাব্দীর পক্ষে এক বিস্ময় মনে হতে পারে। আধুনিক কালেও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই গানের বিশেষ অনুরাগী এবং কোন কোন ব্যক্তি বাউলের আদর্শে একাধিক গান বেঁধেছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিকির-চাঁদ বাউলই প্রথম বাউল গানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজে কতকগুলি গান

রচনা করেছিলেন যা প্রশংসা পেয়েছে। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে বাউল দলে যোগ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও শিলাইদহে অবস্থান কালে লালন ফকিরের সংস্পর্শে আসেন এবং লালন ফকিরের গানের ভাব ও ভাষায় মুগ্ধ হয়ে সে সমস্ত গানের প্রচারে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সব বাউল গানের আদর্শে নিজে বাউল গান রচনা করেন এবং সেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মার্জিত রূপে বিধৃত।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন ও ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনেক বাউল গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন।

বাউল গানের কথা বলতে গিয়ে বাউল সাধনার কথা একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বাউলরা কিন্তু কেবল গানের জন্য গান বাঁধেননি— গানের মধ্য দিয়ে তাঁরা সাধনার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন।

বাউলরা শাস্ত্রবিধি, ভেদ-আচরণ, তীর্থ-প্রতিমা, জাতি-পঙ্‌ক্তি মানেন না। মানবতাই তাঁদের সার কথা, তাঁদের একমাত্র ধ্যান ধারণা। তাঁদের সাধনার মূলকথা হল প্রেম। ভগবানও এই প্রেমের কাছে ধরা দিতে ব্যাকুল। লোকমত প্রভৃতি এই প্রেমের উন্মোচনের বাধা। তাই বাউল বলেন—

'তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে।'…

বাউলরা মনে করেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই 'মনের মানুষ' আছেন এবং তাঁকে আবিষ্কার করে উপলব্ধি করতে পারলেই মোক্ষ-নির্বাণ-মুক্তি। এঁরা পূজা-অর্চনা প্রভৃতি সম্পর্কে খুবই উদাসীন—এমন কি হিন্দু-মুসলমানে কোনও ভেদ তাঁরা স্বীকার করেন না। এঁদের সাধনা নির্জনে বসে কেবল 'মনের মানুষের' সন্ধান করা, তাই বাউলরা বলেন—

'তত্ত্বে ফত্ত্বে মন মানে না, মনের মানুষ চাই-ই-চাই।'…

গগন বাউল কেঁদে বলেন—

'আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে।'…

বাউলদের গুরু অগণিত জীবন্ত মানুষ, তাই তাঁরা বলেন—

'অনিক গুরু পথিক গুরু, গুরু অগণন,
গুরু বলে কারে প্রণাম করবি রে তুই মন।'...

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দরবেশ, সাঁই, কর্তাভজা, আউল প্রভৃতি সাধকেরাও বাউলপন্থী।

এ হল মোটামুটি বাউল সাধনার কথা। বাউল গান সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাউলদের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। এঁরা নিজেদের আড়ালে রেখে চলতেন, তাই বেশীর ভাগ বাউলের শুধু ভণিতা ছাড়া আর বিশেষ কিছু পরিচয় মেলে না। তবে এর মধ্যে দু'জন প্রধান বাউলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন লালন ফকির ও দ্বিতীয় জন পঞ্জশাহ্।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বাউল সংগীতের বিশিষ্ট কবির দেখা মেলে। উনবিংশ শতাব্দীর বাউল কবিদের মধ্যে লালন ফকিরের নামই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ঢাকা জেলার শানাল ফকির এবং কলাকোপার বলাই ক্ষেপার নাম বিশেষ পরিচিত। তাঁদের রচনা গভীর ও মর্মস্পর্শী। শিরাজ সাঁই লালন ফকিরের গুরু। তাঁর রচনার মধ্যে গভীরতা, কবিত্ব ও রসব্যঞ্জনা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। উভয় বঙ্গের অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাউল কবিদের মধ্যে গগন বাউল, গঙ্গারাম বাউল, বাঙ্গালী বাউল, জগ কৈবর্ত, পদ্মলোচন, মেছেল চাঁদ, পাগলা কানাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাউল সংগীত বাউল-গুরুদের শিষ্য-পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে।

বিশিষ্ট বাউলদের দু-একজনার গানের বিষয় এখানে আলোচনা করছি। বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের গান যে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তার মূলে ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও উদ্যোগ। কারণ তিনিই লালন ফকিরের গানে মুগ্ধ হয়ে এ গানের প্রচার করেন ও সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। কবি তাঁর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' বা 'মানুষের ধর্ম' নামক 'হিবার্ট লেকচারস'-এ বাংলার বাউল সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন। এই আলোচনায় লালন শাহ ফকিরের গান স্বভাবতই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

লালন ফকির সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও কোন দৈবদুর্বিপাকে পড়ে এক মুসলমান দম্পতির গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। মুসলমান স্ত্রীলোকটিকে লালন 'মা' সম্বোধন করতেন। লালন পরে নিজ গৃহে

ফিরে গেলে তাঁর সমাজ তাঁকে গ্রহণ করতে চায় না। তখন তিনি আবার ফিরে আসেন সেই মুসলমান দম্পতির গৃহে। তিনি ফকিরী ধর্ম গ্রহণ করে লালন শাহ নামে পরিচিত হন। তিনি কোথাও ভাবের বশে রাধা-কৃষ্ণের কথা বলেছেন আবার কোথাও গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান রচনা করেছেন কারণ তিনি বাউল ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁর অনেক হিন্দু শিষ্যও ছিল। রীতি-পদ্ধতি অনুসারে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। লালন ফকিরের রচিত গৌরাঙ্গ ভাবের গান।'…

'ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্য কি পারবি তোরা,
কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হতে হবে জ্যান্তে মরা।'…

কখনও সুফী ভক্তির বশে বলেছেন—

'নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়,
সেই যে আকার কি হল তার কে করে নির্ণয়।'…

আবার মনের মানুষের কথায় বলেছেন—

'বল কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে,
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে।'…

এরপর পঞ্চশাহের গানের উল্লেখ করতে হয়। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধাচার মেনে চলতেন। তাঁর গানগুলি অধ্যাত্মচেতনা ও কাব্যের দিক থেকে লালন ফকিরের গানের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। তাঁর একটি বিখ্যাত গান উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হল—

'শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে পরে
পাবি ওরে মন-পাগেলা,
যে ভাবে আল্লাতালা বিষমলীলা ত্রিজগতে করছে খেলা।
কত জনে জপে মালা তুলসীতলা,
হাতে ঝোলে জপের ঝোলা,
আর কত জন হরি বলে মারে তালি, নেচে গেয়ে হয় মাতেলা।'…

এই গানের মধ্যে বাউল গানের মূল তত্ত্বটি খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে। এখানে বাউল কবি বলছেন যে, গোঁড়া হিন্দু মুসলমান শাস্ত্র পুরাণ, কোরাণ হাদিস মিলিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করে, কিন্তু স্বরূপ-মানুষ বা মনের মানুষের কথা এ ভাবে জানা যায় না।

পঞ্চশাহ্ সম্বন্ধে সে রকম তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে লালন ফকিরের কবিত্ব সম্পর্কে মানুষ যে রকম আগ্রহান্বিত, পঞ্চশাহ্ সম্বন্ধে সে রকম নয়। অবশ্য নিরপেক্ষ বিচারে পঞ্চশাহ্ বাউল হিসাবে লালন ফকিরের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না বলে গুণীজন বলেছেন।

বর্তমানে বাউল গান জনসাধারণের মনে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। বাউল গান প্রচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। তিনিই এই গানে আকৃষ্ট হয়ে নিজে ঐ ঢঙে বহু গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্যই বিশেষ করে লালন ফকিরের নাম ও গান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বাউল গান অতি সহজ ও সরল ভাষায় রচিত। সাংসারিক কথাবার্তাও এ গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে— তবে এর মধ্যে রয়েছে একটা অধ্যাত্ম ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক গভীরার্থ। সাধারণ মানুষ অবশ্য সেগুলি ঠিক বুঝতে পারে না, তবে সাধক সম্প্রদায়ের কাছে সেগুলির মর্ম অজ্ঞাত নয়।

দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিষয়ক বাউল গান বাংলার এক নিজস্ব সম্পদ। কি ভাবে, কি ভাষায়, কি তত্ত্বকথায়, কি সাহিত্যিক উৎকর্ষে বাউল সংগীত আমাদের দেশে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে—এমন কি সুদূর ইউরোপও এই বাউল গানকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। বাংলার এই লোকসংগীত আজ পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ইউরোপ-আমেরিকার একাধিক দেশ বাংলার এই লোকসংগীত শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেছে এবং বাউল গান সেখানকার শ্রোতাদের বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছে। তাঁরা এই বাউল গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন এবং বাউল শিল্পীদের প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করেছেন। বর্তমান যুগের বাউল গানের শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ করে পূর্ণদাস বাউলের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বহুবার বিদেশ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং সেখানকার শ্রোতৃবৃন্দকে অপার আনন্দ দিয়েছেন তাঁর বাউল সংগীতের মধ্য দিয়ে। সম্প্রতি পূর্ণদাস বাউল আবার ইউরোপ সফর করে ফিরেছেন— এবারও নিয়ে এসেছেন জয়মাল্য। বিদেশের শ্রোতারা বাউল গানের সুর আয়ত্ত করার খুব চেষ্টা করছেন।

বাউল গান হল ভাবপ্রধান এবং এই গান একতারা যন্ত্রের সাহায্যে নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হয়ে থাকে। বাউল গানে ছন্দোবৈচিত্র্য আছে। এ গানের মধ্যে নাথযোগীদের ভাব ও ভাষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বাউল গান যাঁরা পরিবেশন করেন তাঁদের কণ্ঠ উদাত্ত আর তাঁরা প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আসরে দাঁড়িয়ে গান পরিবেশন করেন। কোন কোন বাউল পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেন এবং সঙ্গে একতারা বাজিয়ে গান পরিবেশন করেন। কেউ কেউ তার সাথে কোমরে বাঁয়া বেঁধে নেন। লোকান্তরিত নবীনদাস বাউল (পূর্ণদাস বাউলের পিতা) এই প্রক্রিয়ায় গান পরিবেশন করতেন। সব কিছু মিলে বাউল গান আজ সর্বজনসমাদৃত। এই লোকসংগীত আমাদের সংগীত ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ। বহু শিল্পী এই লোকসংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল সম্পর্কে বলেছেন—"লোক সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।"

কবিগান

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কবিগানের উদ্ভব হয়। এসব গানের গায়কদের কবিওয়ালা বা কবিয়াল বলা হয়ে থাকে। গ্রামে কবিগানের বিশেষ আদর ছিল, শহরেও আদর কম ছিল না। পুরাতন কলিকাতার ধনী সম্প্রদায় এই গীতিশাখার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, মহারাজ নবকৃষ্ণ তাঁদের অন্যতম। সেকালের ধনী সম্প্রদায় সন্ধ্যাকালে নিজ নিজ মজলিশে কবিগানের আসর বসাতেন। কবিগানের আসরে বহু লোক সমাগম হত। কবিওয়ালাদের শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু এঁদের উপস্থিত বুদ্ধি ও সহজাত কবিত্ব-শক্তিকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। কবিওয়ালারা সভায় দাঁড়িয়ে মুখে মুখে গান রচনা করে তাতে সুর যোজনা করে গাইতেন, আর সেই গানের পাল্টা জবাব অপর পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতেন। এই ভাবে কবির লড়াই চলত। কবি-যুদ্ধে রুচি ও শীলতার বালাই ছিল না এবং গানগুলি অনেক স্থলেই কুরুচিপূর্ণ ছিল, কিন্তু ধনী সম্প্রদায় ঐ সব কুরুচিপূর্ণ গান খুব উপভোগ করতেন। এ সব আসরে প্রথমে ঠাকুর-দেবতার বন্দনা দিয়ে শুরু করে পরে কবিওয়ালারা ঠাকুর-দেবতা ফেলে রেখে নানা অনুপ্রাস ও যমকের চমক লাগিয়ে প্রকাশ্য আসরে অতি অশ্লীল প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন আর চূড়ান্ত অশ্লীল জায়গায় এলে তাদের ঢোল কাসিও সজোরে বেজে উঠত।

ধনী পৃষ্ঠপোষকেরা জয়ী পক্ষকে বাহবা দিতেন ও প্রচুর টাকা কড়ি খেলাত দিতেন। দরিদ্র কবিওয়ালাদের ভাগ্যে সে সময় নানা মূল্যবান জিনিস জুটে যেত। কবিওয়ালাদের বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা না থাকলেও উপস্থিত বুদ্ধি, পুরাণাদি সম্পর্কে জ্ঞান, ভাষা ও ছন্দের জ্ঞান, আর সর্বোপরি সংগীতে অসাধারণ দখল ছিল।

কবিওয়ালাদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হরু ঠাকুর), নৃসিংহ ঠাকুর, গোঁজলা গুঁই, ভোলা ময়রা, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী, রামসুন্দর স্যাকরা, রূপচাঁদ পক্ষী, মধু কান, এ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে রাম বসু, হরু ঠাকুর কিছুটা অভিজাত কবিওয়ালা ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত ও দাশরথি রায় কবির দলের গান বাঁধতেন। প্রাচীন কবিওয়ালা হিসাবে গোঁজলা গুঁইয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সব পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কবিওয়ালা। আধুনিক কালে পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালদের মধ্যে শেখ গোমানি দেওয়ান (মুর্শিদাবাদ) ও লম্বোদর চক্রবর্তী (বীরভূম)-র নাম সুপরিচিত।

পশ্চিমবঙ্গ কবিগানের মূলকেন্দ্র হলেও পূর্ববঙ্গেও কবিগানের আসর বসত। পূর্ববঙ্গের কবিওয়ালাদের মধ্যে মৈমনসিংহের রামু মালী, ফরিদপুরের নারায়ণ বালা ও রাজেন্দ্র, বরিশালের বিজয় দত্ত, নকুল ও গঙ্গামণি দাসী এবং ত্রিপুরার হরি আচার্য ও বিলাসিনী দাসী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাম থেকেই দেখা যাচ্ছে, পূর্ববঙ্গে কেবল পুরুষ কবিয়ালই ছিল না— কোন কোন জায়গায় মেয়ে কবিয়ালেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। যেমন ত্রিপুরার বিলাসিনী, বরিশালের গঙ্গামণি, পদ্মাবতী প্রভৃতি।

পূর্ববঙ্গে কবির আসর বসত খোলা মাঠের মাঝখানে শামিয়ানা খাটিয়ে। নীচে পাতা হত সতরঞ্চি, হোগলা অথবা মাদুর। দেখতে দেখতে সারা চত্তরটা মানুষের ভিড়ে জমজমাট হয়ে যেত। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, এ আসরে জবাব ও প্রতিজবাবের মাধ্যমে কবির লড়াই বা তর্জা শুরু হত। কবিগানে কোনও বাঁধাধরা কাহিনী থাকে না। কবির দলের যে মূল কবিয়াল, তাঁকে কোন কোন অঞ্চলে 'সরকার' বলে। কবিগানে ঢোল আর কাসি হল প্রধান বাজনা। কবিয়ালরা প্রতিপক্ষকে জব্দ করবার অভিপ্রায়ে ব্যক্তিগত কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান শুরু করেন এবং এতে যে কোন ধরনের অশ্লীল কথা ব্যবহার করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না অর্থাৎ যে কোন উপায়ে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করাই লক্ষ্য। গান ছাড়া দু' পক্ষের ঢোলের 'লহরা'ও

চলে। কবিগানের মধ্যে কবিয়ালরা যত রকম অনুপ্রাস ও যমকই ব্যবহার করুন না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়পক্ষের লড়াই না বাধে ততক্ষণ আসর জমে না। লড়াইয়ের পর যে পক্ষ জয় লাভ করে তাঁদের ভাগ্যে প্রচুর পুরস্কার জুটে যায়।

সেকালে কবিগানের আসর খুবই বসত, কিন্তু মাঝে এ আসরের কথা সাধারণে যেন ভুলে যেতে বসেছিল। কিন্তু কবিগানের উপর বাঙ্গালীর একটা স্বাভাবিক মমতা বোধ আছে, তাই কবিগান লুপ্ত হয়ে যাবার পথে গিয়েও আবার নিজ মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এ গান বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ। কবিয়ালদের কবিত্ব শক্তিকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। উচ্চ শিক্ষা লাভ না করেও এঁরা মুখে মুখে গান রচনা করে তাতে সুর যোজনা করে আসরে গাইতেন আর তাতে সকলেই বিমুগ্ধ হত। কবিগান বাংলার লোকসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অঙ্গ।

সারিগান

পূর্ববঙ্গে সারিগান সর্বত্রই প্রচলিত। পূর্ববঙ্গে নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হয় বর্ষাকালে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে আর সেই উপলক্ষ্যে যে গান গীত হয় তাকে সারিগান বলে। মাঝিরা নৌকা চালাবার সময় বৈঠার তালে তালে যে সব গান গাইত তা সারিগানের পর্যায়ে পড়ে। বর্তমানেও এই সব গান মাঝিরা গেয়ে থাকে।

সারিগানের কোন মূল কবি থাকেন না— মাঝিরা পল্লীকবিদের রচিত গানই গেয়ে থাকে। এ সব গানের বিষয়বস্তু হল নৌকা, নদী ও জল, তবে রাধা-কৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করেও গান রচিত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর গানকে 'নৌকাবিলাস' পর্যায়ে ফেলা হয়। করুণ ভাবের প্রাধান্যও সারিগানে পরিলক্ষিত হয়। এই গানের সুরের গতি খুব দ্রুত এবং সুরের দিক্ দিয়ে ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। সারিগানে তালের বৈচিত্র্য আছে। গায়কদের গাইবার ভঙ্গির উপর ভাটিয়ালী ও সারিগানের পার্থক্য নির্ভর করে। সারিগান বহুজনের সম্মিলিত কণ্ঠ-সংগীত। সারিগানের একটি নমুনা দিই।

নৌকাবিলাসের গান—

'আরে ও কানাই পার করে দে আমারে,
আজিকার মথুরার বিকিদান করিব তোমারে।
তুমি ত সুন্দর কানাই তোমার ভাঙ্গা না,
কোথায় রাখবো দইয়ের পশরা,
কোথায় রাখবো পা।'...

এটি রাধা-কৃষ্ণ লীলার নৌকাবিলাস সম্পর্কিত গান, একে সারিগান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তবে বাইচের প্রতিযোগিতায় মাঝিরা বৈঠার তালে তালে যে গান গাইত সেই গানই হচ্ছে প্রকৃত সারিগান। সারিগানে রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। একটি সারিগানের নমুনা—

'জয় দে লো রামের মা তোর গোপাল আইল ঘরে
ধান্য দুর্বা বরণ কুলা দে লো ঐ গলুয়ের কপালে।'...

বাইচের প্রতিযোগিতায় যারা জয়ী হয় সে সব নৌকার মাঝিরা নিজের গ্রামে ফিরে যাবার সময় এই ধরনের গান গাইত। এই গানের মধ্যে গ্রামীণ সমাজের প্রাণপ্রাচুর্য ও প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মাতৃস্নেহ লাভের জন্য আবেগ খুব সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে। এ সব গানে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকের মতে ছাদ পেটানোর সময় যে গান গাওয়া হয়ে থাকে তাকেও সারিগান পর্যায়ে ফেলা যায়। দুইয়ের সুরের নৈকট্যই এরকম ভাববার কারণ। সারিগান লোকসংগীতের এক বিশিষ্ট শাখা আর বাংলার এক নিজস্ব সম্পদ।

জারিগান

সারিগানের মত জারিগানও দলবদ্ধ ভাবে গাওয়ার রীতি আছে। বীর ও করুণরসের মিশ্রণে এই গান রচিত হয়েছে এবং ময়মনসিংহ জেলায় এ গান বিশেষ ভাবে প্রচলিত। জারিগান নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করা হয় এবং একজন মূল গায়েনের পরিচালনাধীনে অন্যান্য গায়করা দলবদ্ধ হয়ে ঘুঙুর পায়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে যায়।

মূল গায়েন কাহিনীর ধারা-বিবরণ দেন গানের মাধ্যমে আর অপর গায়করা ধুয়া ধরেন। জারিগান মুসলমানদের অতিপ্রিয়। কারবালার

যুদ্ধবৃত্তান্তকে বিসয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে জারিগান রচিত হয়েছে। যেমন—

'আরে হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেম পানি হাতে লইয়া,
কলেজা অঙ্গার হইল পানির লাগিয়া রে-এ-এ।'…

হজরত ইমাম হোসেনের মর্মান্তিক হত্যার কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই গান। এখানে করুণ রসের সার্থক প্রকাশ। পূর্ববঙ্গে সাধারণত এই গান গাওয়া হত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে। নবমীর দিন দেশের সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান সব দলে দলে বিভক্ত হযে দুর্গামণ্ডপে উপস্থিত হয়ে জারিগান গাইত। 'জারি' শব্দটি হচ্ছে ফারসী—এর অর্থ বিলাপ। এই গানের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সুর বেজে উঠত। তখন মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের উৎসবে উপস্থিত হয়ে আনন্দ উৎসবের ভাগীদার হত। জারিগানের সুর খুব সুন্দর এবং এর মধ্যে সরল কাব্যভাব ও সরসতা প্রকাশ পায়। জারিগান লোকসংগীতের আর এক দিক্। এ গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে কারবালার যুদ্ধ-কাহিনী ছাডাও আছে দেহতত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা, দুর্গা কিংবা অপর কোন দেব দেবীর প্রসঙ্গ অথবা পুরাতন রাজপরিবার সংক্রান্ত কোন করুণ ঘটনা। জারিগানও মাঝে লুপ্ত হয়ে যাবার মতো হয়েছিল, গুণীজন আবার জারিগানের পুনঃপ্রচারের উদ্যম শুরু করেছেন।

ভাটিয়ালী

বাংলা পল্লীগীতির অন্তর্গত এই ভাটিয়ালী গান। সাধারণত এই ধরনের গান মাঝিরা নদীপথে গেয়ে থাকে। এ গানের মধ্যে আছে আত্মসমর্পণ ও আত্ম-নির্ভরতার আকুতি। মানুষ যখন নিজেকে একান্ত একা মনে করে, তখন সে সমস্ত অন্তর দিযে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে—প্রকাশ করে নিজ অন্তরের বেদনা। মাঝি নদীর বুকে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে ভাটার টানের উপর নিভর করে একান্তে গেয়ে ওঠে—

'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না,
আমি জন্মাবধি বাইলাম তরী রে
তরী ভাইটায় ছাডা উজায় না।'…

এ গানটির মাধ্যমে মাঝি ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এখানে মাঝি তার দেহকে তরীর সঙ্গে উপমিত করে বলতে চেয়েছে যে, তার দেহতরী জীর্ণ এবং সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, তাই তার দেহতরী সংসার রূপ বিরাট সমুদ্রে আর চলতে পারছে না—সে আজ অক্ষম।

ভাটিয়ালী গানের কথা ও সুর মানুষের মনকে উদাস করে তোলে। আর এর মধ্যে ভাবের গভীরতাও আছে, তাই অন্যান্য পল্লীগীতি থেকে ভাটিয়ালী গান একটু পৃথক ধরনের। নদ-নদী দিয়ে পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ—নদীর পারে সুখ-দুঃখ বিজড়িত কুটীরসমূহ দণ্ডায়মান। নদী কখনও এই সব কুটীরকে অতলে তলিয়ে দেয়, আবার নদীই ধরণীকে করে তোলে শান্ত ও শস্যশ্যামলা। জীবনের এই ভাঙ্গা-গড়ার সঙ্গে মাঝিরা যেন তাল রাখতে পারে না—মাঝি তখন নদীর ভাটার টানে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে গান গেয়ে ওঠে, আর সেই গানই হল ভাটিয়ালী গান।

পল্লীগীতির মধ্যে ভাটিয়ালী গানের একটি বিশেষ স্থান আছে। পূর্ববঙ্গের জলপথে এর সমধিক চর্চা। পশ্চিমবঙ্গে যেমন বাউল, পূর্ববঙ্গে তেমনই ভাটিয়ালী। তারই খানিকটা পরিবর্তিত রূপ উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া আর চটকা।

ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া গানের কথা বলতে গেলে উত্তরবঙ্গের শিল্পী প্রয়াত আব্বাসউদ্দীন আহমেদের কথা সবিশেষ মনে পড়ে। এত সুন্দর আবেগপূর্ণ ভাটিয়ালী আর ভাওয়াইয়া গান অপর কারও কণ্ঠে নিঃসৃত হয়েছে বলে বোধ হয় না। এর পরই পূববঙ্গের ভাটিয়ালী গানের শিল্পী শচীনদেব বর্মনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, আগরতলা প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটিয়ালী গান তাঁর কণ্ঠে অপূর্ব আবেগমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি তিনি দেহরক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু চৌধুরীর নামও বিশেষ সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে ভাটিয়ালী গান পরিবেশন করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর কণ্ঠ খুবই উদাত্ত ও বলিষ্ঠ। অমর পালও একজন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরযুক্ত ভাটিয়ালী গায়ক।

বর্তমান কালে ভাটিয়ালী গানের কণ্ঠরূপায়ণে পূর্বেকার শিল্পীদের দরদ যেন কম-বেশী অলভ্য। যথার্থ নিষ্ঠার অভাব এবং নাগরিকতার ভেজালের অনুপ্রবেশের জন্যই এরূপ হচ্ছে বলে মনে হয়। যাই হোক, ভাটিয়ালী গান

বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ এবং এই সম্পদ আমাদের সংগীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সুতরাং এর কথা ও সুর অবিকৃত রাখা আমাদের এক জাতীয় দায়িত্ব।

তরজা

চর্যা থেকে শুরু করে বৈষ্ণব সাহিত্য, বাউল, পাঁচালী, কবিগান, তরজা, সারি, জারি, গাজন, ভাটিয়ালী, মালসী প্রভৃতি গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত ভাবের প্রভাব বিদ্যমান। আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে 'তরজা'র উল্লেখ পাই। চরিতামৃতে আছে—

'তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা,
তাঁর যেই আজ্ঞা করি মৌন করিলা।'

এ থেকে বোঝা যায় যে চৈতন্যযুগেও তরজার প্রচলন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকেই ঢোল কাসি সহযোগে ছড়া কেটে গান করবার রীতি ছিল, আর এই ছড়াগুলি শৈব সন্ন্যাসীরা ধর্মঠাকুর ও শিবের গাজন উপলক্ষ্যে পথে পথে গেয়ে বেড়াতেন। এর নাম আর্যা কিংবা তরজা।

এর পর খেউর গানের কথা উল্লেখ্য। খেউড় গান খানিকটা তরজা গানের পর্যায়ে পড়ে। এতে একদল অপর দলের উপর দোষ চাপিয়ে কুৎসা প্রচার করত আর অপর দল তার প্রতিবাদ করে নিজের কুৎসার ভিন্ন অর্থ করত। গানের ভিতর দিয়ে তর্কে-বিতর্কে বেশ একটা আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হত খেউরে। খেউর হালকা চালের গান এবং এ গান অশিক্ষিত ও অমার্জিত লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে মার্জিত ভাষা বা ভাব ছিল না। খেউড় গানে সুর ও তালের কোনও বৈচিত্র্য দেখা যায় না। কেবল কয়েকটি সহজ তাল ও রাগের মধ্যে তার প্রকাশ সীমিত ছিল। এ গান জনসাধারণের কাছে বিশেষ উপভোগ্য হত। বর্তমানে 'আকাশবাণী'র অনুষ্ঠানে তরজা গানের আসর বসে এবং সাধারণে তা উপভোগ করে।

আখড়াই

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ওস্তাদী গানের ঢং নিয়ে কবিগানের আর একটি রূপ প্রকাশিত হয়—তার নাম আখড়াই। কিন্তু কবিগানের মতো এর মধ্যে উক্তি ও প্রত্যুক্তির লড়াই ছিল না—লড়াই ছিল সুরে কারুকার্য ও গাইবার ভঙ্গীর মধ্যে। তখনকার দিনের বড়লোকদের বৈঠকখানায় এই গানের আসর বসত, আর এটা একটা বিলাসিতার অঙ্গ ছিল। বিশেষ করে মহারাজা বাহাদুর নবকৃষ্ণ দেব এই ধরনের বৈঠকী গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

তিন রকমের গানের দ্বারা এই সংগীত পরিবেশিত হত। প্রথমে দেবী বিষয়ক গান, তারপর প্রণয় সংগীত এবং শেষে প্রভাতী। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধ্রুপদ, খেয়ালের মতো এতে রাগের আলাপ ও সুরবিস্তার বিদ্যমান ছিল। রচনা, গাইবার ভঙ্গী ও সংগতের বেশ পারিপাট্য ছিল। এই গানের মধ্যে লয়ের খেলাও ছিল যথেষ্ট। সেকালের আখড়াই সংগীত এবং প্রণয়গীতি রচয়িতাদের মধ্যে নিধুবাবু ছিলেন শ্রেষ্ঠ। এ ছাড়া আখড়াই সংগীত রচনায় আরও অনেক সংগীতজ্ঞ, কবি নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে শ্রীদাম দাস, রাম ঠাকুর ও নসিরাম স্যাক্‌রা আখড়াই সংগীতের দলপতি হিসাবে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন, তবে নিধুবাবুর মাতুলপুত্র কুলুইচন্দ্র সেনকে আখড়াই সংগীতের জন্মদাতা বলা চলে। নিধুবাবু এই সংগীতের নতুন রূপ দিলেন এবং তাঁর গায়ন পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে।

নিধুবাবু এই শ্রেণীর বৈঠকী গানের একজন বড় ওস্তাদ ছিলেন। আখড়াই গানে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী তাল মান অনুসৃত হত। মার্গরীতিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হত এবং নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত। এ গানের প্রতি মার্জিত রুচি-বিলাসী সম্প্রদায়ের অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। বাংলা সংগীতের ধারার মধ্যে এর একটি বিশেষ স্থান আছে। এই আখড়াই গান থেকেই হাফ-আখড়াই গান প্রচলিত হয়। হাফ-আখড়াইকে বলা যেতে পারে সে যুগের রাগপ্রধান সংগীত।

মালসী

বাংলাদেশে মালসী গান এক সময়ে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সকলের মুখেই এ ধরনের গান শোনা যেত। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ গানের প্রচলন ছিল। সে সময়ে সব রকম মঙ্গল অনুষ্ঠানে এই মালসী গান গাওয়া হত। এ গান ছিল দেব-দেবী বিষয়ক। বহু কবি এই ধরনের গান রচনা করেছেন। তবে মালসী গান রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান কবি হিসাবে রামপ্রসাদকেই চিহ্নিত করা হত। এ বিষয়ে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদের রচনার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, অতি সাধারণ অশিক্ষিত মানুষও তাঁর সরল ভাষায় রচিত গানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারত। আবার উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতগণও তাঁর রচনার ভাবতত্ত্বের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। সরল ভাষা ও ভাবের গভীরতার মিলনে রাম-প্রসাদের রচিত গান হয়ে উঠেছিল সর্বজনপ্রিয়। মুখ্যত কালী বিষয়ক সংগীতই মালসী নামে প্রচলিত হয়। আজও জনসাধারণ রামপ্রসাদের গানের অত্যন্ত অনুরাগী। এ সমস্ত সংগীতে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে বটে, তবে কবি যখন ভাবের ঘোরে এ গান গাইতেন তখন তিনি রাগ ও তালের নিয়ম-গুলি ধরে রাখতে পারতেন না। রামপ্রসাদ রচিত একটি মালসী গান—

'ঝিঁঝিঁট—একতালা

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥

… … …

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি।
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥'…

ভক্ত কবি কমলাকান্তের রচিত একটি গান—

'তবে তারা তোমার ভরসা বল কে করে।
যদি আপনার কর্মফল ফলিবে আমারে॥
মাগো যে পথে চালাও তুমি
তবে সুখ দুঃখের ভাগী কেন করিলে আমারে।'

রামপ্রসাদের ভাবের সঙ্গে কমলাকান্তের ভাবের পার্থক্য আছে। যদিও

দুজনেই মায়ের সঙ্গে বিবাদ করছেন তবু রামপ্রসাদের বৈদান্তিক ভাব কমলাকান্তের মধ্যে কম। কমলাকান্তের সব পদই হল ভক্তিরসাত্মক। উপরি-উক্ত গানের মধ্যেও ভক্তিরসের সন্ধান মেলে। মালসী গান বাংলার সংগীত ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ।

মঙ্গলগীতি

'মঙ্গলগীতি' বলতে সেই গীতকে বোঝায় যা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে। পূর্বকাল থেকে বাংলাদেশে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে, এ সব গানের প্রচলন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু নিদর্শন থাকলেও এ রকম মঙ্গলগীতির ব্যাপক প্রচলন নেই। পূর্ববঙ্গে মাঙ্গলিক গীতি সারা বৎসর ধরেই কোন না কোন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে। এই ধারার গান বাংলার এক নিজস্ব সম্পদ।

বৈশাখ মাসে অসহ্য গরম, খাল বিল নদী সব শুকিয়ে যায়। চাষীরা যে নতুন বীজ রোপণ করে তাও তখন শুকিয়ে যাবার উপক্রম হয়। এই বীজ থেকে গাছ ও পরে ফলবে সোনার ফসল এই আশায় চাষীরা গান ধরে—

'ফাগুন মাসে দেলাম লাঙ্গল, চৈত মাসে বীজ,
বৈশাখেতে চিক্ চিকানী জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ।
আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফসল ফলে,
ছেরা বনে আতস ধান গেরহস্তেতে তোলে।'…

বীজধান বুনবার সময় চাষীরা খুব ভোরে উঠে ক্ষেতে গিয়ে হাজির হয়। তার মধ্যে যে চাষী প্রধান সে জমির মাঝখানে একটি ঘট স্থাপন করে এবং খুব ভক্তিসহকারে বসুমতীকে প্রণাম করে। অন্যদিকে ঠিক ঐ দিন চাষী বোরা সারাদিন উপবাসী থেকে বাড়ীর সংলগ্ন মাঠে ক্ষেত্তর ব্রত করে। এতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর সংলগ্ন মাঠে একটি ঘট স্থাপন করে তাতে আম্রপল্লব ও সিঁদুরের পুত্তলি দেওয়া হয়। যিনি বয়স্কা, তিনি ব্রতের কাহিনী বলতে থাকেন। অন্যান্য ব্রতীরা হাতে ফুল ও দূর্বা নিয়ে ব্রতকথা শোনে আর ব্রতকথা শেষ হলে হাতের ফুল ও দূর্বা ঘটের উপর রেখে দেয়। তারপর সমবেত কণ্ঠে ব্রতের গান করে—

'বন্দেমাতা বসুমতী পুরাণে মহিমা শুনি
অগতির গতি মাগো মোরে কর ত্রাণ।'…

এইরূপে ক্ষেত্তর ব্রত সমাপ্ত হয়। এ সব মঙ্গলগীতি প্রধানত পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। এ ছাড়া বৈশাখ মাসে মঙ্গলচণ্ডী পূজার রীতি আছে পূর্ববঙ্গে। সব এয়োরা মিলে এই পূজা করে থাকে। এতেও ব্রতকথার মধ্যে মা মঙ্গল-চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। মঙ্গলচণ্ডী পূজার রীতি অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও কিছু কিছু দেখা যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী ব্রত। সন্তানের মায়েরা এই ব্রত করে থাকেন। এতেও ব্রতীরা ব্রতকথা পাঠ করে। ষষ্ঠীব্রত বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে।

এরপর আসে বর্ষা। পূর্ববঙ্গ সর্পবহুল দেশ আর বর্ষায় সাপের প্রকোপ বাড়ে। এই সময়ে সমস্ত গৃহস্থের বাড়ীতে সর্পদেবী মনসার ঘট বসে। শ্রাবণ মাসের পয়লা থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি ঘরে ঘরে মনসামঙ্গলের পুঁথি পড়া হয় সুর করে। মনসাদেবীর মাহাত্ম্য নিয়েই ঐ সব গান রচিত। তারপর গাওয়া হয় মনসা-ভাসানের গান, তাকে 'রয়ানী' গান বলা হয়। মনসা-ভাসানের গান অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও আছে, তবে পূর্ববঙ্গের ভাসানের গানকেই 'রয়ানী' বলে। 'রয়ানী' গানের বৈশিষ্ট্য এই যে, যেখানে এই গানের আসর বসবে সেখানেই গানের আদ্যোপান্ত শেষ করতে হবে। গানের একটি নমুনা—

"ওগো আমার মা, বন্দিলাম বন্দিলাম চরণ তোমার,
স্বর্গ হইতে বন্দিলাম দেবের প্রধান,
সীমান্ত হইতে বন্দিলাম তোমায়
ওগো তোমার ও চরণেতে মতি পাই যেন,
আমি 'নারায়ণ' যেন চরণে পাই স্থান॥'…

মূল যে গায়ক তিনি এ গান গান।

তারপর ভাদ্র সংক্রান্তিতে নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি-যোগিতায় যে পক্ষ জয়ী হয় ঘরে ফিরবার সময় তারা এই গান গায়—

'জয় দে লো রামের মা তোর—
গোপাল আইছে ঘরে।'…

তারপর শরৎকাল এসে যায়—দুর্গা পূজার মরশুম। এ উপলক্ষ্যে পল্লী-বাসীরা সমস্ত পল্লী ঘুরে ঘুরে আগমনী গান গেয়ে থাকে।

মা দুর্গা তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে আসছেন—তাই এত আয়োজন

পিতৃগৃহে। তিন দিন পর বিজয়াদশমীর দিন মা দুর্গা সবাইকে অশ্রুসিক্ত করে আবার স্বামীগৃহে ফিরে যান। এ উপলক্ষ্যে বিজয়া গানের প্রচলন হয়।
আগমনী গান—

'গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।'··

কন্যার সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই গিরিরাণী এ কথা বলছেন গিরিরাজকে। আবার বিজয়ার গান—

'ওরে নবমী নিশি না হইওরে অবসান,
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সতের মান।'···

এখানে মা মেনকার করুণ আবেদন—যেন নবমী নিশি না পোহায় আর নবমী নিশি না পোহালে দশমীর প্রভাত আসবে না, তাহলে কন্যারও স্বামিগৃহে যাওয়া হবে না। মা মেনকার আকুলতা ফুটে উঠেছে খুব সুন্দর ভাবে এই বিজয়ার গানটির মধ্যে। এইরূপ সমস্ত অনুষ্ঠানেই আনুষ্ঠানিক গান গাওয়ার রীতি বাংলাদেশে চলে আসছে।

শরৎ চলে যাওয়ার পর মাঠঘাটের জল কমতে থাকে—দেখা দেয় মহামারী। তখন খোল-করতাল বাজিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পাঁচমিশালী গলায় নগর-কীর্তন শুরু করে। তারপর কোন বাড়ীর আটচালায় বসে হরির লুট দেয় নগর-কীর্তনের পালা শেষ করে—

'লুট পইড়্যাছে লুটের বাহার
লুটে নে রে তোরা,
চিনি সন্দেশ ফুল বাতাসা
মণ্ডা জোড়া জোড়া।'···

তারপর ধান কাটার পালা এসে যায় অগ্রহায়ণ মাসে—প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর উঠানে উঠানে দেখা যায় ধানের বোঝা। তখন প্রভাতে চারণ কবি খোল করতাল সহযোগে বাড়ী বাড়ী ঘুরে গান গেয়ে গৃহস্থের ঘুম ভাঙান—

'ভোর সময় কালে শ্রীবাস আঙ্গিনা মাঝে
গহুর চাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে।'···

ধান কাটার পর তা ঝেড়ে মুছে গোলায় তোলা হল—এবার নবান্ন উৎসব ঘরে ঘরে। এ উপলক্ষ্যেও গান গাওয়া হয়ে থাকে। কবিগুরু লিখেছেন—

'নতুন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।'...

এইভাবে প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই মাঙ্গলিক গীতি পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠানেও গান গাওয়া পূর্ববঙ্গের এক রীতি। বিবাহের আগের দিন শেষরাতে বাড়ীর বৌরা একজোট হয়ে পুকুরে জল আনতে যেত কলসী নিয়ে। একে 'জল সওয়া' বলে। এ অনুষ্ঠানেও গান গাওয়ার রীতি ছিল। যেমন—

'চল সখী যমুনায়
বাঁশী ডাকে আয় আয়
চিন্তামণি জল ভরিতে যায়।'...

তারপর বিবাহের দিন সকালে দশটা নাগাদ কনেকে স্নান করাবার পালা—এয়োরা মিলে কনেকে হলুদ দিয়ে স্নান করাত এবং গান গাইত—

'আন আন হলুদ বাইট্যা
আন সকালে,
কমলারাণী ছানে চইল্যাছে।'...

এইভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানে গান গাওয়া পূর্ববঙ্গের এক প্রথা। বিবাহ উপলক্ষ্যে গানের রেওয়াজ পশ্চিমবঙ্গে নেই বললেই চলে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রত্যেক সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য অনুষ্ঠান-উপযোগী গান রচনা করে গেছেন—যার কতক গান বিবাহ-উৎসব উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে অধুনা বিবাহ-উৎসবে রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক গান আধুনিক রুচিসম্পন্ন পরিবারে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে নীল পূজার রীতি আছে আর সে উপলক্ষ্যে গানও গাওয়া হয়ে থাকে। তবে পূর্ববঙ্গের মতো এত প্রাণস্পর্শী আনুষ্ঠানিক গান হয়ত খুব কমই পাওয়া যায়। এ গানের জগৎ যেন ভিন্ন—এর মধ্যে যেন প্রাণের টান রয়ে গেছে। এ সমস্ত মঙ্গলগীতি আমাদের দেশের এক অমূল্য সম্পদও বটে আবার নিজস্ব সম্পদও বটে। মঙ্গলগীতি শহরাঞ্চলে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে, তবে কিছুসংখ্যক গুণীব্যক্তি এ সব গান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন। ফলে কিছু কিছু গান আবার প্রচলিত হচ্ছে, যেমন—আগমনী ও বিজয়ার গান। মঙ্গলগীতির ভাষা খুবই সাধারণ ও সহজ অথচ একটা আন্তরিকতার সুর আছে

তার প্রকাশের মধ্যে। এ সব গানের সঙ্গে ভাবীকালের মানুষের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা গানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব

প্রাচীন যুগের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় প্রাচীন যুগ থেকেই রাগ-রাগিণী বাংলা গানের উপর প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এ বিষয়ে বলতে গেলে রাগ-রাগিণীর উৎস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নিতে হয়। রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি কবে হয়েছিল তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। তবে চর্যাপদ বিশ্লেষণ করলে প্রতিপন্ন হয় যে, চর্যাযুগ থেকেই বাংলা গানে রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ হয়ে এসেছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ সালে বাংলা ভাষায় রচিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক একখানি পদ-সংগ্রহ আবিষ্কার করেন। এর সমস্ত পদগুলিতেই রাগের উল্লেখ রয়েছে। পদের বিষয়বস্তুর মধ্যেও রয়েছে দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনার দিক্, কারণ চর্যাপদকাররা বিশেষ এক যোগপন্থার সাধক ছিলেন। এখানে চর্যার একটি পদ উল্লেখ করা হল—

১নং পদ

'কাআ তরুবর পঞ্চবিডাল
চঞ্চল চীত্র পৈঠা কাল।'…

এই পদটি রাগ পটমঞ্জরীতে গেয় বলে উল্লেখ আছে। এই রাগ পরবর্তীকালের গানের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। পণ্ডিতগণের মতে চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এর মধ্যে নানা রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে অনুমেয় যে, পরবর্তীকালের সঙ্গীতজ্ঞরা এর থেকে প্রেরণা পেয়েছেন এবং তা বাংলা গানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন তাল সহযোগে। চর্যাপদের পর জয়দেবের গীতগোবিন্দের কথা এসে পড়ে। গীতগোবিন্দের পদগুলির মধ্যেও রাগ-রাগিণীর সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দের 'গীতম্' পর্যায়ের একটি পদ এখানে উল্লেখ্য—

'দেশাগরাগৈক তালীতালাভ্যাং গীয়তে
স্তনবিনিহত হার মুদারম্
সা হনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥'

এই পদটিতে দেশাখ রাগের উল্লেখ করা হয়েছে। রাগ ছাড়া গীত-গোবিন্দের অপর বৈশিষ্ট্য হল তাল এবং এই সমস্ত তাল বর্তমানে উচ্চাঙ্গ কীর্তনে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত রাগের উল্লেখ আছে তারও বেশীর ভাগ রাগই বর্তমানে পরিবেশিত হচ্ছে।

এরপর বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উল্লেখ করতে হয়। এই গ্রন্থটির পদের মধ্যেও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রয়েছে। যেমন বরাড়ী, ধানুষী, গুর্জ্জরী, পাহাড়ী প্রভৃতি এবং অন্যান্য আরও বহু রাগ। পরবর্তীকালে এর মধ্য থেকে অনেক রাগই বাংলা গানে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর বিদ্যাপতি,দ্বিজ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকারগণ যে সব পদ রচনা করে গেছেন তার মধ্যে রাগ রাগিণীর উল্লেখ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এ থেকে এ কথা প্রতিপন্ন হয় যে, কেবলমাত্র মার্গ-সংগীতেই রাগ রাগিণী ব্যবহৃত হয়নি—এই রাগ-রাগিণী চর্যাযুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিভিন্ন বাংলা গানে অবিচ্ছেদে পরিবেশিত হয়ে আসছে।

চৈতন্য যুগে কীর্তনেব মধ্যে রাগ-রাগিণীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর পদের মধ্যে নানা রাগ-রাগিণী বিদ্যমান।

এরপরই সাধক কবি রামপ্রসাদের নাম মনে পড়ে যায়। তিনি জগৎমাতার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত গীত রচনা করে গেছেন তার মধ্যে রাগের উল্লেখ ত আছেই, উপরন্তু আছে অন্তঃস্পর্শী ভাষার আবেদন। রামপ্রসাদের পর সাধক কবি কমলাকান্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য— তিনিও তাঁর গানের মধ্যে রাগের ব্যবহার করেছেন।

এরপর রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর নাম বিশেষ উল্লেখ্য। নিধুবাবুর টপ্পা গান গুণীমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়ে আসছে। শোরী মিঞা প্রথম টপ্পা গান প্রচলন করেন। নিধুবাবু এই টপ্পা গানের ঢঙটিকে আয়ত্ত করে নিয়ে নিজের সাবলীল ভাষা ও সুরের মাধ্যমে নিজস্ব স্টাইলে প্রকাশ করেন, যা শ্রোতাদের আনন্দ দিয়ে এসেছে। নিধুবাবুর টপ্পা গান আমাদের সঙ্গীত ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ।

এ ক্ষেত্রে দাশরথি রায়ের পাঁচালীরও উল্লেখ করা যেতে পারে। দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালীর মধ্যে ললিত ও বিভাস রাগ ব্যবহার করেছেন। যেমন—

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল

'হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি

ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি
হবে রাধা সতী।'…

এ পর্যন্ত যাঁদের প্রসঙ্গ করা হল তাঁদের বিষয়ে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে, কাজেই এ সম্বন্ধে আর সমধিক বিস্তারের আবশ্যকতা দেখি না। এবার নতুন যুগের প্রসঙ্গ।

রাগ-রাগিণী ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি ধ্রুপদাঙ্গ গান রচনা করেছেন, যা অধ্যাত্ম ভাবে পরিপূর্ণ। তাঁর রচিত একটি গানের উল্লেখ করা হল—এ গানে তিনি বাগেশ্রী রাগ ব্যবহার করেছেন, যেমন—

ধ্রুপদ বাগেশ্রী—তাল মধ্যমান
'স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।'

রামমোহনের পর গিরিশ ঘোষ রচিত শ্যামাসঙ্গীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিও তাঁর গানের মধ্যে রাগ ব্যবহার করেছেন। এরপর বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্য এখানে উল্লেখ্য। সারদামঙ্গল কাব্যেও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। এরপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি রাগ-রাগিণী সহযোগে অনেক গানে স্বরারোপ করেছেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ রাগের উপর ভিত্তি করে বহু গান রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম বয়সের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি সবই রাগাশ্রিত ও ধ্রুপদাঙ্গ। বাংলা গানের সমৃদ্ধি বিধানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোন তুলনা হয় না। কতভাবে যে তিনি রাগ-রাগিণীর ব্যবহার করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এখানে উচ্চ-রাগাশ্রিত কবিগুরুর দুটি গানের উল্লেখ করা হল—

সিন্ধু কাফি—ঝাঁপতাল
চরণধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবনতীরে
কত নীরব নিরজনে, কত মধুসমীরে।'…

কিংবা,

শঙ্করা—চৌতাল
'আমারে করো জীবন দান,
প্রেরণ করো অন্তরে তব আহ্বান।'…

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজে কতকগুলি তাল সৃষ্টি করেছেন। যেমন—ষষ্ঠীতাল, নবতাল, ঝম্পক, একাদশী, রূপকড়া ও নবপঞ্চক ইত্যাদি। তিনটি গান এখানে উল্লেখ করা হল, যেমন—

সাহানা—নবতাল

'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।'...

ভৈরবী—রূপকড়া

'ঐ রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।'

সুরট-মল্লার—একাদশী

'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে।'...

এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল। যদিও তিনি পাশ্চাত্ত্য সংগীতের রীতি-নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাঁর গানের মধ্যে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমসাময়িক কালে কবি রজনীকান্ত সেনের আবির্ভাব হয়। তাঁর গান ভক্তিভাবে ভরপূর, তবে তাঁর ভক্তির গানেও রাগের সুস্পষ্ট আমেজ রয়েছে। যেমন—

ভৈরবী—জলদ একতাল

'তুমি নির্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে,
তব পূণ্য-কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহকালিমা ঘুচায়ে।'...

রজনীকান্তের পর অতুলপ্রসাদ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তার অন্তরের আকুলতা সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন—এবং এই সব সংগীতের মধ্যে নানা রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—মিশ্র আশাবরী, মিশ্র মল্লার, দেশ-পিলু, ভৈরবী ইত্যাদি। অতুলপ্রসাদ সংযোজিত একাধিক গানে ভৈরবীর প্রভাব লক্ষ্যগোচর। তাঁর ভৈরবী রাগাশ্রিত দুটি গান—

'পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ্।'...
'তাহারে ভুলিব বল কেমনে।'...

অতুলপ্রসাদের গানে ঠুংরী গায়নভঙ্গীর সুস্পষ্ট আমেজ দৃষ্ট হয়। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌ শহরের অধিবাসী। লক্ষ্ণৌ ঠুংরী গান চর্চার এক প্রধান কেন্দ্র।

এরপর সুরের ডালি সাজিয়ে সংগীত জগতে আবির্ভূত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি নানা রাগ-রাগিণীর উপর ভিত্তি করে নতুন ঢঙে বাংলা গান রচনা করলেন। তাঁর গান বাংলা সংগীত জগতে এক নতুন সাড়া এনে দিল। তাঁর একটি বিখ্যাত গান যোগিয়া রাগকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছিল—

'কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা,
আনমনে ভাসাও চম্পা শেফালিকা।'...

একদা এ গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, একালেও গানটি শ্রোতাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়ে থাকে। আর একটি বিখ্যাত গান ছায়ানট রাগকে আশ্রয় করে রচিত। গানটি হল—

'শূন্য এ বুকে পাখী মোর ফিরে আয়।'...

এইরূপে বিভিন্ন যুগের গীতিকার ও সুরকারগণ তাঁদের সংগীতের মধ্যে রাগ-রাগিণী পরিবেশন করেছেন।

এ থেকে বলা চলে যে, চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত একাদিক্রমে রাগ-রাগিণী বাংলা গানের উপর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে আর তারই ফলে বাংলা গান এক বিশেষ উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

এরপর সুরসাগর হিমাংশু দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা গানে নানা রাগ-রাগিণী ব্যবহার করে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি অবশ্য নিজে কবি ছিলেন না, তবে সুরকার হিসাবে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। প্রচলিত রাগ ভিন্ন নিজে তিনি কয়েকটি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রচলিত রাগাশ্রিত গান—

'আজি রজনী শেষে
কে গো ডাকিলে মোরে।'...

এই গানটির মধ্যে বেহাগ ও ভৈরবী রাগের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

সুরসাগর সৃষ্ট রাগের একটি গান—

রাগ পুষ্পচন্দ্রিকা

'ছিল চাঁদ মেঘের পারে
বিরহীর ব্যথা লয়ে
বাঁশরীর সুর হয়ে
কে গো আজ ডাকিল তারে।'...

এ গানটিও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

এরপর রাগকে আশ্রয় করে আরও বহু গুণীজন বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র মার্গ সংগীতেই রাগ-রাগিণী সীমাবদ্ধ নয়—চর্যাযুগ থেকে বাংলা গানেও রাগ-রাগিণীর স্রোত বয়ে চলেছে এবং তা বাংলা গানকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধিশালী করেছে। এ সমস্ত বাংলা গান বাংলার জাতীয় সম্পদ।

কীর্তনে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী ব্যবহারের ইতিহাস

কীর্তনে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর ব্যবহার বহু পূর্বকাল থেকে প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে আলোচনা করার আগে কীর্তন সম্পর্কে দু-একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম কথা হচ্ছে কীর্তন কাকে বলে? পূর্বেও আমরা বলেছি যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, কোন দেব-দেবী বা মহামানবের যে যশোগান করা হয় তাকেই কীর্তন বলে এবং পদাবলী ভগবানের যশোগান বলেই তাকে কীর্তন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জয়দেবের সময় থেকে পদাবলীর শুরু এবং যুগ ও কাল হিসাবে তা নতুন রূপ ধারণ করে চৈতন্যযুগে। নরোত্তম দাস পদাবলী কীর্তনের এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। কীর্তন বিভিন্ন রকমের, যেমন—পদাবলী কীর্তন, পালা কীর্তন, নগর কীর্তন, নাম সংকীর্তন, ইত্যাদি।

এখন দেখতে হবে কীর্তনের মূল উৎস কোথায়?—প্রাচীন সাহিত্যের পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, চর্যাযুগ থেকে প্রবন্ধগীতির মধ্য দিয়ে কীর্তনের প্রকাশ ঘটেছে এবং রাগ-রাগিণীর ব্যবহারও চর্যাযুগ থেকে শুরু হয়েছে। চর্যাপদের পদকর্তাগণ ছিলেন বিশেষ যোগপন্থার সাধক এবং এ সমস্ত পদের মধ্যে তাঁরা তাঁদের দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনার কথা গুহ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। তা ছাড়া চর্যাপদে যে সমস্ত রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে তার সঙ্গে মার্গ-সংগীতের রাগ-রাগিণীর যথেষ্ট মিল রয়েছে। কেবলমাত্র রাগ-রাগিণী নয়, চর্যাপদে বিভিন্ন তালেরও উল্লেখ রয়েছে। চর্যাপদে ব্যবহৃত কয়েকটি রাগের নাম এখানে উল্লেখ করা হল। যেমন—পটমঞ্জরী, গুর্জরী, কামোদ, ভৈরবী ইত্যাদি। মার্গ-সংগীতেও এ সমস্ত রাগ-রাগিণীর ব্যবহার আছে।

এ থেকে এ কথা প্রতিপন্ন হয় যে, চর্যাপদে মার্গ-সংগীতের রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে চর্যাপদ হল বাংলা কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ দুটি গ্রন্থের পদের মধ্যেও যে মার্গ-সংগীতের নানা রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে সে বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। গীতগোবিন্দের গীতগুলিতেও রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। এ সমস্ত পদে যে রাগ ব্যবহৃত হয়েছে তা বর্তমানে কেবল উচ্চাঙ্গ কীর্তনেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন—বসন্ত, রামকিরী, কর্ণাট, বরাড়ী, ভৈরবী এবং আরও অনেক রাগ। এ সব রাগের বেশীর ভাগ মার্গ-সংগীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কি ভাষায়, কি ভঙ্গীতে, কি ছন্দে জয়দেবের গীতগোবিন্দ এক সার্থক সৃষ্টি। এ হল তাল ও রাগ সমন্বিত সুন্দর গীতিকাব্য। গীতগোবিন্দ থেকে বাংলা গানে নতুন ধারা প্রবর্তিত হল।

এর পর বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে আমরা প্রাচীনতম বাংলার গীতিনাট্যের রূপ দেখতে পাই। এ কাব্যের পদের মধ্যেও নানা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, যেমন—বরাড়ী, ধানুষী, গুর্জ্জরী, পাহাড়ী, আহের, কেদার, মল্লার ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও অনেক রাগ। যুগের সংগে সংগে সব কিছুতেই একটা পরিবর্তন আসে, তাই জয়দেবের পর বড়ু চণ্ডীদাসের প্রবন্ধ-গানে প্রাচীন প্রবন্ধ-গান থেকে একটু পৃথক গীতরীতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ বড়ু চণ্ডীদাস প্রবন্ধ-গানের ধারাকে রক্ষা করে তার মধ্যে নাটকীয় রীতি প্রবর্তন করে সংগীতে এক নতুন রূপের জন্ম দিলেন, অবশ্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে।

এ থেকে এটুকু বুঝতে পারা যায় যে, কীর্তনে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই শুরু হয়েছে। চর্যাযুগ থেকে প্রবন্ধ-গানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে এবং আলঙ্কারিকরাও বলেছেন জয়দেবের সময় ও তার পূর্বে প্রবন্ধ-গান ছিল কীর্তনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ-রাগিণী কীর্তনে পূর্ব থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

প্রবন্ধ-গান সম্পর্কে শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় যে, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রবন্ধ-গান তার আদি রূপ থেকে অভিজাত সংগীতের রূপে পরিবর্তিত হয়। এ ছাড়া শার্ঙ্গদেবের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্রবন্ধ-গানের নিয়মাবলীর সংগে কীর্তনের নিয়মাবলীর যথেষ্ট মিল

আছে। প্রবন্ধ-গান সম্পর্কে নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন যে, প্রবন্ধ-গান ছয় অঙ্গ-যুক্ত। এই ষড়ঙ্গ হল—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল। এই ষড়ঙ্গ-যুক্ত প্রবন্ধ-গানই হল কীর্তন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বলা হয়েছে—

'প্রবন্ধস্য ষডঙ্গানি স্বরশ্চবিরুদং পদম্
তেনকঃ পাট তালো চ স্বরা সরিগমাদয়ঃ ॥'

স্বর বলতে সা, রে, গা, প্রভৃতি স্বরকে বোঝায়, বিরুদ অর্থে স্তুতি। তেনক মঙ্গলবাচক। পাট বলতে বোঝায় তাল যন্ত্রের বোল, আর যার দ্বারা অর্থ প্রকাশ হয় তাকে বলে পদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরমতে সংকীর্তনের গানগুলিকে পদ বলা হত।

সে যুগে কীর্তন গায়কেরা শাস্ত্রীয় সংগীতের নিয়মগুলিকে কীর্তনে ব্যবহার করেছিলেন। প্রবন্ধ-গানের পাঁচ রকম জাতি আছে, যেমন—মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, ভাবনী ও তারাবলী। আলঙ্কারিকদের মতে তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ-গান হল পদ ও তাল সমন্বিত।

আমরা দেখলাম যে, কীর্তন গান প্রবন্ধ-গানেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রবন্ধ-গানেব নিয়মাবলীর সঙ্গে কীর্তনের নিয়মাবলীর সুস্পষ্ট মিল আছে।

চৈতন্যযুগে কীর্তন এক নতুন রূপ ধারণ করল। চৈতন্যযুগে পদাবলী কীর্তন শাস্ত্রীয় সংগীতকে আশ্রয় করে নতুন রসে ও ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে নিজেকে প্রকাশ করল। তখন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক স্বরূপ দামোদর, মুরারি গুপ্ত, রায় রামানন্দ, হরিদাস ঠাকুর, রূপ-সনাতন প্রমুখেরা শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ-রাগিণী ও তাল সহযোগে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রচিত পদাবলী মহাপ্রভুর নিকট পরিবেশন করতেন এবং মহাপ্রভু ভাববিভোর হয়ে সে সংগীতের রস আস্বাদন করতেন। এ বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে—

'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥
ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল, করে মধুর গান,
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি গীতগোবিন্দ রীতি
শুনি প্রভুর জুড়াইল কান ॥'…

কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি থেকে এ কথা বুঝতে পারা যায় যে, চৈতন্যদেব এ সমস্ত কীর্তন গানের রসাস্বাদন করে প্রভূত আনন্দ লাভ করতেন।

চৈতন্য ভাগবতেও আমরা চৈতন্যদেবের নামকীর্তনের বিষয় জানতে পারি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মহাপ্রভুই প্রথম নামকীর্তনের মধ্যে শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ-রাগিণী ব্যবহার করেছেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শিষ্যদের কীর্তন শিক্ষা দিতেন—

'হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'

উপরি-উক্ত কীর্তনে কেদার রাগের উল্লেখ আছে।

চৈতন্য-আবির্ভাবের পর থেকে পদাবলী কীর্তনে এক নতুন রস ও ভাবের প্রকাশ ঘটে। এর কারণ চৈতন্য-পূর্ব যুগে যে সমস্ত পদ রচিত হয়েছে তা রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা অবলম্বনে, আর চৈতন্য-পরবর্তীকালের পদকর্তারা চৈতন্য-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পদ রচনা করেছেন। তা ছাড়া চৈতন্য-ভাবকে প্রত্যক্ষ করে যা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের পদের মধ্যে সুন্দর ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার সহযোগে। এ সমস্ত পদে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়ে তা এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আলোচিত তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে, শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ-রাগিণী চর্যাযুগ থেকে প্রবন্ধ-গানের মধ্য দিয়ে কীর্তনে প্রবেশ করেছে। সুতরাং কীর্তনে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার প্রাচীনতা মণ্ডিত।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সংগীত

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধারার সংগীত রয়েছে, তার মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীত একটি বিশেষ ধারা। রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে কিছু জানতে বা বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের কথা কিছু জানা প্রযোজন। আর রবীন্দ্রনাথের কথা কিছু বলতে গেলেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের কথা এসে পড়ে এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলেই কেবল রবীন্দ্র-সংগীতকে আন্তরিকভাবে জানা যায় বা উপলব্ধি করা যায়। এ কথা স্বীকার্য যে, সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সংগীতের প্রকাশ আর সেই সাহিত্য হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারলে রবীন্দ্র-সংগীতকেও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সহজ হয়ে পড়ে।

প্রথমত রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি আবার কেবলমাত্র কবি নন—কি উপন্যাসে, কি নাটকে, কি কাব্যে, কি ছোটগল্পে, কি প্রবন্ধে, কি সমালোচনা সাহিত্যে, কি দর্শনে, কি শিল্পচর্চায়, কি সংগীতে, কি গীতিনাট্যে, কি সুরসংযোজনায় কবি ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কবির প্রতিভা ছিল এতই বহুমুখী আর এতই প্রগাঢ়সৃষ্টিধর্মী যে তার সঙ্গে অপর কোন দেশের আর কোন কবিরই প্রতিভার বোধ করি তুলনা হয় না।

তিনি দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, আর তার থেকে শ্রেষ্ঠ সম্ভারগুলিকে সংগ্রহ করে তাকে নিজস্ব ধারায় সৃষ্টিশীলতায় মণ্ডিত করে স্বীয় সাহিত্যে ও সংগীতে পরিবেশন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কবি কবিতা হিসাবে যা রচনা করেছিলেন তার কয়েকটি পরবর্তীকালে গানে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, যেমন—'খেয়া' কাব্যের 'শেষখেয়া' কবিতাটি। খেয়া কাব্য রচনার পশ্চাতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। পর পর কয়েকটি বিয়োগান্ত ঘটনার আঘাতে কবিজীবনের মর্মে যে আলোড়ন জেগেছিল তারই অনবদ্য শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে খেয়া কাব্যে। কবির উপলব্ধিতে ওপারে যাবার সময় হযেছে বলে যেন একটা অনুভবের সঞ্চার হয়েছে, তাই তিনি বলেছেন—

'দিনের আলো যার ফুরালো
সাঁঝের আলো জ্বললো না

সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়
ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়।'…

কবি খেয়া ঘাটের ধারে এসে বসেছেন—কবি-কল্পনায় ওপারে এক অসীম রহস্যের দেশ দেখছেন। কিন্তু সেই রহস্যের দেশে যাবার পথে কবিকে সাহায্য করবে কে?—কারণ তিনি ঘরের মায়া কাটিয়ে উঠতে না পেরে মাঝখানে রয়ে গেছেন। কবি বলছেন—

'ঘরেও নহে পারেও নহে
যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।'…

তারপর 'বলাকা' কাব্যের 'ছবি' কবিতা—

'তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা?
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা ক'রে আছে ভিড়।'…

এই কবিতাটির মধ্যে কবি গতিবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই কবিতাটিতেও পরবর্তীকালে সুর সংযোজিত হয়। এ ছাড়া 'ওরে সাবধানী পথিক' ও 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে'—এ দুটি কবিতায়ও পরে সুর সংযোজিত হয়েছে। এ থেকে এ কথা প্রতিপন্ন হয় যে, সাহিত্য, কাব্য ও সংগীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

কবিগুরু ছিলেন সুন্দরের পূজারী ও সুদূরের পিয়াসী। তাঁর এই সৌন্দর্য-তৃষ্ণা ও সুদূরের পিপাসার চমৎকার অভিব্যক্তি দেখা যায় 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' এই গানটিতে। জীবনের সব কিছুর মধ্যেই কবি সুন্দরকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। কবি রচিত একটি কবিতা 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' এখানে উল্লেখ্য। কালো রূপকে সাধারণ দৃষ্টিতে কেউ সুন্দর দেখে না, কিন্তু কবি এখানে কালোর মধ্যেও অপরূপকে খুঁজে পেয়েছেন। এই কবিতাটিও পরবর্তীকালে সুরারোপ করে গানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কবির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পৃথক ধরনের—সাধারণ মানুষ সাধারণ বস্তুর মধ্যে যা খুঁজে পায় না, কবির দৃষ্টিতে তার মধ্যেই একটা অসাধারণ সুন্দর রূপ ধরা পড়েছিল। এমনকি কবি মৃত্যুর মধ্যেও সুন্দরকে প্রত্যক্ষ

করেছেন। 'গীতাঞ্জলি'র একটি কবিতায় কবি মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন—

'যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরমদিনে সাজিয়ে দিব উহারে
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।'…

এখানে কবি এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, সেই পরমক্ষণটির জন্য তিনি সব কিছু সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছেন মরণকে উপহার দেবেন বলে। কবি আর একটি গানে বলেছেন—

'বরণ মালা গাঁথা আছে
আমার চিত্ত মাঝে
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।
সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই বা আপন কেই বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা,
মরণ আমার মরণ তুমি কও আমারে কথা।'…

মৃত্যুর মধ্যে যে মধুর রূপ কবি দেখেছেন, ইতিপূর্বে এমন করে মৃত্যুকে আর কেউ সন্দর্শন করেছেন বলে মনে হয় না। মৃত্যুর সঙ্গে প্রিয়-মিলনের অভিব্যক্তির কী চমৎকার শিল্পরূপ—

'মরণ সে তো প্রিয়ার চুম্ লুটিয়ে পড়ে আলিঙ্গনে।'…

এভাবে কবি সুন্দরকে তাঁর সাহিত্যে, গানে ও কবিতায় প্রকাশ করেছেন। কবি মৃত্যুকে ব্যক্তিবিশেষ রূপে দেখেছেন এবং তার মধ্যে সুন্দরকে আবিষ্কার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যে গন্ধে গানে ভাবে সর্বত্র সুন্দরের লীলাখেলাই তাঁর চোখে পড়েছে এবং সেই অনুপম সৌন্দর্যানুভূতিকেই তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর বিবিধ রচনাবলীতে।

এখন কবির সংগীত চর্চা সম্বন্ধে কিছু বলছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত চর্চা সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন, "আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা

সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।" কবির এই উক্তিতে বোঝা যায় যে, সংগীতের অনুরাগ তাঁর আজন্ম সহচর। শিশুকাল থেকেই তিনি সংগীতের আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবি ছেলেবেলায় যদু ভট্টের নিকট উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা লাভ করেন এবং ওই শিক্ষার ফলে উচ্চাঙ্গ সংগীত তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই অনুপ্রাণনার পরিচয় আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের উচ্চ রাগাশ্রিত গানগুলির মধ্যে।

কবি জন্ম-রোমান্টিক আর এই রোমান্টিক ভাব কবির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি-মনকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে দূর-দুরান্তরে কত অজানার সন্ধানে, সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের অভিমুখে। কবি যে জন্ম-রোমান্টিক তা কবির 'জীবন-স্মৃতি'র কয়েকটি লাইনে ব্যক্ত হয়েছে এই ভাষায়—"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া শ্লেট লইয়া লিখিলাম— 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে'।" এক দিক দিয়ে একে মিষ্টিক ভাবও বলা যায়, কারণ এর ভিতর একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আছে।

পরবর্তীকালে কবির এই মিষ্টিক ভাব বহু কবিতায় ও গানে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন—

'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।'··

এ গানটির মধ্যে কবির অধ্যাত্মচেতনার পরিপূর্ণ প্রকাশ। এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর সেই সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের সন্ধানে, রূপকে ছাড়িয়ে অরূপের সন্ধানের যাত্রার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবি বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই ভাবের বশবর্তী হয়ে কবি প্রথম বয়সে লিখেছেন 'ভানুসিংহের পদাবলী' এবং তার ভণিতায় 'ভানুসিংহের' নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন—'কহে ভানু তব দাস'।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত সংগীত রচনা করেছেন তা 'গীতবিতান' পুস্তকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির প্রথম খণ্ডে পূজা·পর্যায়ের গান ও বিখ্যাত স্বদেশী গানগুলি মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে প্রেম পর্যায়ের গান—তার মধ্যে আছে প্রেমবৈচিত্র্য ও নানা ঋতু অথবা প্রকৃতিকে নিয়ে রচিত গান। এ ছাড়াও এই খণ্ডে

বিচিত্র অংশে বহু গান আছে। এখানে কবির বিষয়বৈচিত্র্যের প্রকাশ এবং এদিক্ থেকে কবির গান বহুমুখী। তৃতীয় খণ্ডে আছে গীতিনাট্য।

প্রেম ও পূজা পর্যায়ের গানে কবির অধ্যাত্মচেতনার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রেমের মধ্যেই পূজা আর পূজার মধ্যেই প্রেমের দ্যোতনায় গানগুলি শ্রেষ্ঠব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। অনুভবের সৌকুমার্য ও সূক্ষ্মতা গানগুলির এক প্রধান সম্পদ। এই দুই পর্যায়ের গানে কবির ঐশী প্রেরণা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সব গানে কবি প্রেমের যে রূপ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা অন্যত্র দুর্লভ। পূজা পর্যায়ের একটি গান—

'তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে
সত্য করে পায় সে আপনারে।'…

এ গানে ঐশী প্রেমেরই জয়গান করেছেন কবি। আবার অপর একটি গানে বলেছেন—

'যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু।'…

এখানেও সেই ঐশী উপলব্ধির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। পূজা পর্যায়ের আর একটি গান—

'আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।'…

কবি প্রেম ও পূজা পর্যায়ের গানে প্রেমের মধ্যে পূজা ও পূজার মধ্যে প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উভয় পর্যায়েই অধ্যাত্মচেতনা প্রকাশ পেয়েছে অনবদ্য সংগীত শিল্পরূপের ভিতর দিয়ে। তিনি বলেছেন—

'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।'

এই ভাবটিই কবির প্রেম ও পূজা পর্যায়ের গানসমূহের মূল সুর। এখানে প্রেম পর্যায়ের কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হল—

১। বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে।
২। আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।
৩। না বলে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম না জানে।
৪। কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—

এর প্রত্যেকটি গানের মধ্য দিয়ে মূলত ঐশী প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও পূজা পর্যায়ের গানে তাঁর নিজস্ব মিষ্টিক চেতনাকেই অনবদ্য ভাষায় রূপ দিয়েছেন। এ সমস্ত গান অধ্যাত্মচেতনার পূর্ণপ্রকাশ। ঈশ্বরকে তিনি নানা ভাবে, নানা রূপে উপলব্ধি করেছেন এবং তাকে রূপায়িত করেছেন সংগীতের মধ্য দিয়ে।

প্রকৃতি পর্যায়ে কবি তাঁর গানের মধ্যে ঋতুবৈচিত্র্যের সুন্দর আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। ছয় ঋতুর চমৎকার ছবি তিনি গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি গানে কবি বলেছেন—

'হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি—
কতই বরণ, কতই গন্ধ, কত গীত, কত ছন্দ রে ॥'···

এটি অবশ্য পূজা পর্যায়ের গান। ঋতু পর্যায়ের মধ্যে আবার বর্ষা ঋতু কবির অত্যন্ত প্রিয়, তাই কবি বর্ষাকে নানা ভাবে, নানা রূপে রূপায়িত করেছেন। বর্ষার শুরুতে কবি বর্ষাকে আহ্বান করেছেন এই বলে—

'এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।
বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে ॥'···

বর্ষার বিরহ-ব্যাকুলতার ভাবটি এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। কবি লিখেছেন—

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।'···

এর অপর কলিতে আছে—

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িত-চকিত-নয়না,
মালতী মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।'···

এই কয়টি লাইনের মধ্যে কালিদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্য দ্বারা যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এখানে তারই প্রকাশ হয়েছে। এর পরই কবি বলেছেন—

'এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা।'...

এই গানটি কবি 'কল্পনা' কাব্যে কবিতা হিসাবে প্রথমে লিখেছিলেন, পরে এটি গানে রূপান্তরিত হয়।

প্রকৃতি পর্যায়ে কবি প্রকৃতির ছয় ঋতুরই বর্ণনা করেছেন তাঁর গানের মধ্যে। বর্ষার বর্ণনা কবির আর একটি গানে এই রূপে পাই—

'শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে।'...

এটি 'ভানুসিংহের পদাবলী'র গান। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কবি বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উপরি-উক্ত গানটিতে কবি ঘোর ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে শ্রীরাধার অভিসার যাত্রার বিঘ্ন সম্পর্কে বলেছেন। অর্থাৎ আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, তায় ঘোর রজনী, অবলা বালা কুঞ্জের পথে কি করে অগ্রসর হবেন! এখানে কবি রাধার মনের ভাব গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

আবার যখন অশ্রান্ত বর্ষণ শুরু হয়েছে তখন কবি বলছেন—

'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে,
আকাশভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।'...

আবার রোমান্টিক কবি-মন বর্ষার দিনে এক অজানা পথের সন্ধানে দূর-দিগন্তে ছুটে চলেছে। কবি গেয়ে উঠছেন—

'কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে।'...

অশ্রান্ত বর্ষণে অশান্ত কবি-মন যেন আর ঘরে থাকতে চায় না—ছুটে যেতে চায় অনন্তের অভিমুখে। বর্ষার উপযোগী রাগ হচ্ছে মল্লার। কবি এখানে মল্লার রাগটি খুব সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেছেন। রোমান্টিক কবি আবার গেয়ে ওঠেন—

'মন মোর মেঘের সঙ্গী
উড়ে চলে দিগ্‌দিগন্তের পানে,
নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণসংগীতে
রিমিঝিম-রিমিঝিম-রিমিঝিম॥'...

এখানে গানের মধ্য দিয়ে কবি বর্ষার অপূর্ব ছবি অঙ্কন করেছেন। রিম্‌-ঝিম্‌

শব্দে বর্ষণ শুরু হয়েছে তাই কবি-মন মেঘের সঙ্গে ছুটে চলেছে কোন্‌ দিগন্তের পানে—সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের সন্ধানে।

অশ্রান্ত বর্ষণেরও শেষ আছে—একদিন বর্ষারও বিদায় নেবার পালা আসে। তখন সে সবাইকে অশ্রুসিক্ত ক'রে বিদায় নেয়।—

'বাদল-ধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর॥'...

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবি সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে খুঁজে পেয়েছেন আর সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে দেখেছেন। বর্ষাকে বহু কবি তাঁদের কবিতায় রূপ দিয়েছেন, তবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক ধরনের ও অনবদ্য।

প্রকৃতি পর্যায়ের গান সম্পর্কে আলোচনা করার সময় একটা কথা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে, কবির জীবনে প্রকৃতি শিশুকাল থেকে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে আরও বেশী মিশিয়ে ফেলেছেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কবির প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন, "জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণ ধারে নারিকেল শ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম।"

এখানে কবির নিজ উক্তির মধ্য দিয়েই তাঁর প্রকৃতির প্রতি মমতাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। এরপর কবি প্রকৃতিকে দেখেছেন পেনেটির বাগানবাড়ীতে ও ডালহৌসী পাহাড়ে। এখানে কবি অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে প্রকৃতির বুকে ছুটে বেড়িয়েছেন এবং নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে নিয়ে নির্ঝরের সৌন্দর্যমুগ্ধতার আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠেছেন—

'শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল, তালে তালে দিব তালি।'...

কবি যখন প্রকৃতির বুকে ছুটে বেড়িয়েছেন তখন অন্তর দিয়ে যা উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতির মধ্যে, তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গানে ও কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথের গানে বহু বিচিত্রতার সমাবেশ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা করেছিলেন যদু ভট্টের কাছে এবং উচ্চাঙ্গ

সংগীতের রাগ-রাগিণী দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যে আবার ধ্রুপদ ও টপ্পা গান কবিকে সবিশেষ মুগ্ধ করেছিল। যার ফলে পরবর্তীকালে কবি রাগ-রাগিণীকে আশ্রয় করে বহু ধ্রুপদ ও টপ্পা গানে সুরারোপ করেছেন। ধ্রুপদ ও টপ্পার তুলনায় তাঁর খেয়ালভঙ্গিম গানের সংখ্যা কম। ধ্রুপদ ঢঙের গানের নমুনা পূর্বেই উৎকলন করে দেখানো হয়েছে, এবারে কবিরচিত খেয়াল গানের একটি নমুনা দিই—

রাগ রামকেলি—তাল একতাল
'স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে
পূর্ণ করো হিয়া মঙ্গলকিরণে।'…

তবে এ ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে। খেয়াল গানে খেয়ালের রাগ ও তাল ব্যবহার করলেও কবি কিন্তু কখনও তান ব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথের গানে তান প্রয়োগ হয় না। খেয়ালের ঢঙে সুরবিস্তারও তাঁর গানে অনুপস্থিত। তবে টপ্পা গানে দানাদার তান প্রয়োগে তাঁর আপত্তি ছিল না। টপ্পার ঢঙে 'চিরসখা, ছেড়োনা মোরে ছেড়ো না', 'রূপে তোমায় ভোলাব না' ইত্যাদি বহু গানে সুর বেঁধেছেন কবি। এ ভিন্ন প্রচলিত হিন্দুস্থানী রাগ-সংগীতের রাগকে বজায় রেখে কবি বাংলা ভাষায় গান রচনা করেন। আড়ানা রাগিণীতে কবির একটি বিখ্যাত গান—

'মন্দিরে মম কে আসিলে হে।'…

এই গানটি খেয়াল গান। আড়ানা রাগিণীতে বদ্ধ মূল হিন্দীগানটি এই—

'সুন্দর লাগোরি হৈ পিয়ার বা
চঞ্চল চপল চখন লখন'— ইত্যাদি।

কবির এ ধরনের আর একটি গান—

'চরণধ্বনি শুনি তব, নাথ, জীবনতীরে।'…

এই গানটি সিন্ধু-কাফিতে রচিত। মূল হিন্দীগানের বাণী—

'মুরলী ধ্বনি শুনি অরি মাই যমুনা তীরে।'…

এখানে হিন্দীগানের সঙ্গে বাংলা গানটির ভাবগত মিল দেখতে পাওয়া যায়। এ রকম একটি তেলেনা গান—

'দারা দীম্ দারা দীম্ দারা দীম্ দারা
তাদেরে দানি দানি।'…

এই গানটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কবি বাংলাভাষায় গান রচনা করলেন—

'সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে।'...

আবার একটি চতুরঙ্গ গানের মূল হিন্দী ভাষা—

'চতুরঙ্গ রস সন গায়ে হো
গায়ন গুণী আয়ে
মহম্মদশাকে সব কাজ হস্তী তুরঙ্গ
সরস সুখ পাবে।'...

এ গানটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কবি বাংলাভাষায় গান রচনা করলেন—

'এই বেলা সবে মিলে চলো হো।'...

এ গানটি 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র মধ্যে আছে।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে কবি যে সকল গান রচনা করেছেন তার সংখ্যা বড় কম নয়। পরে অবশ্য কবি রাগ-রাগিণীর প্রভাব কমিয়ে এনে তাঁর গানে মিশ্র সুর আর লোকসংগীতের সুরকেই সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

কবির গানে বৈচিত্র্যের কথা বলতে গেলে আরও দু-একটা কথা বলতে হয়। যেমন দুটি সেতারের গৎ ভেঙে কবি দুটি বাংলা গান রচনা করেছেন। প্রথমটি হল—'এসো শ্যামলসুন্দর' আর দ্বিতীয়টি হল—'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো'। দুটি গানই ত্রিতালে বাঁধা। গৎ-এর ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে কবির এ গান রচনার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

দক্ষিণভারতীয় সংগীত কবিকে মুগ্ধ করেছিল। দক্ষিণভারতীয় ছাত্রী সুগায়িকা শ্রীমতী সাবিত্রীদেবীর কণ্ঠে ঠুংরী চালের 'কৈ কছু কহরে' গানটি কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, তাই তিনি এ গানের সুরে বাংলা ভাষায় রচনা করলেন—'তুমি কিছু দিয়ে যাও।'... দক্ষিণভারতীয় সংগীত থেকে নেওয়া আর একটি গান—'বাজে করুণ সুরে।'...

শ্রীমতী সাহানাদেবীর কণ্ঠে একটি হিন্দীগান শুনে কবি 'খেলার সাথি বিদায় দ্বার খোলো' গানটি রচনা করেন। এ ভাবে কবির গানে নানা বিচিত্রতার সমাবেশ ঘটেছে।

ইউরোপীয় সংগীত কবিকে কতটা আকর্ষণ করেছিল সে সম্পর্কে কবির কথাই এখানে উদ্ধৃত করা হল। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবি বলেছেন— "য়ুরোপের সঙ্গীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি একথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত।

আমার মনে হইত, এ সঙ্গীত রোমান্টিক।" এই উক্তিতেই অনুমান করা যায় য়ুরোপীয় সংগীত কবিকে কতখানি আকর্ষণ করেছিল। কবি য়ুরোপীয় সুরকে আয়ত্ত করে নিয়ে তাকে নিজস্ব ঢঙে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন গানে। য়ুরোপীয় সুর গ্রহণ কালে কোন সুরকেই হুবহু অনুকরণ করেননি—তিনি কেবল য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে এক স্বর থেকে অপর স্বরে যাওয়া-আসার বিশেষত্বটুকু গ্রহণ করে তাকে নিজস্ব ঢঙে পরিবেশন করেছেন। এখানেই কবির প্রতিভা অনন্য। এই ধরনের কয়েকটি গানের উল্লেখ এখানে করা হল, যেমন—

১। তোমার হল শুরু, আমার হল সারা
২। প্রাণ চায় চক্ষু না চায়
৩। জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
৪। আলো আমার আলো ওগো··· ইত্যাদি

এ ছাড়া 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদুবায়' গানটির সুর কবি একটি স্কচ্ গান থেকে গ্রহণ করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। আর একটি গান— 'ওরে সাবধানী পথিক'। এ গানটির একটি কলিতে এই লাইনটি আছে— 'ঝড়ের রাতের ফুলের মতন'। এতে রয়েছে উপরের পর্দা থেকে ধীরে ধীরে নীচের পর্দায় আসার পদ্ধতি। এ য়ুরোপীয় সুর থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

কবির নিজ উক্তিতেই প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি বিলাতি সুরের পরিপ্রেক্ষিতে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র কয়েকটি গানের সুর বেঁধেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবি বলেছেন— "'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অনেকগুলি গান বৈঠকী গান-ভাঙ্গা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটি তিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া।"

কবি 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র ডাকাতদের মত্ততার দুটি গানে বিলাতি সুর ব্যবহার করেছেন, আর একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপ গানে ব্যবহার করেছেন। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন—"এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল।"

কবি অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাই এভাবে বিলাতি সুরকে আয়ত্ত করে নিয়ে তার মধ্যে উপযুক্ত দেশী ভাবা প্রয়োগ করে এমন সুন্দরভাবে সুরারোপ করেছেন যার তুলনা হয় না।

এখন রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী গানের প্রসঙ্গ উল্লেখ্য। আমাদের দেশে অনেকেই স্বদেশী গান রচনা করে গেছেন, তবে এখানে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানই আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

কবির স্বদেশী গানের পিছনে রয়েছে এক রাজনৈতিক পটভূমি। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের বিরুদ্ধে 'রাখীবন্ধন' উৎসবের সূচনা করেন বঙ্গভঙ্গ রহিত করবার প্রয়াসে। এ উৎসবে দেশের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে কবি দলবদ্ধভাবে মিছিল করে গান গাইতে গাইতে চললেন—

'বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।'…

এর পর কবি ইংরেজের বিরুদ্ধে আবার গেয়ে উঠলেন—

'শাসনে যতই ঘেরো
আছে বল দুর্বলেরো,
হওনা যতই বড় আছেন ভগবান,
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবিনে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।'…

এরকম ওজস্বিনী ভাষায় অথচ সুন্দর ছন্দোময় স্বদেশী গান অপর কোন কবি রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। এভাবে আন্দোলন করেই শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রোধ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯১১ সালে দিল্লী দরবারকালে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রহিত করে ঘোষণা প্রচারে বাধ্য হলেন। এই রাজনৈতিক জয়ের পিছনে চারণকবি রূপে রবীন্দ্রনাথেরও যে একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বক্তৃতা দিয়ে যা সম্ভব হয়নি, কবি তা সংগীত দ্বারা সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কবির কয়েকটি বিখ্যাত স্বদেশী গানের উল্লেখ করছি এখানে। প্রথম গানটি হল 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে,' দ্বিতীয়টি 'দেশ দেশ নন্দিত করি,' তৃতীয়টি 'আমার সোনার বাংলা'। এর মধ্যে প্রথমটি ভারতের জাতীয় সংগীত আর তৃতীয়টি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। একই কবির রচিত গান দুইটি রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে এরকম নজীর বোধকরি আর দ্বিতীয় নেই।

কবি কীর্তন, রামপ্রসাদী, বাউল, ভাটিয়ালী, সারি ইত্যাদি গানের ঢঙেও অনেক গানে সুরযোজনা করেছেন। যেমন—

(কীর্তনের সুরে)—১। আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি

২। আবার মোরে পাগল করে দিবে কে

৩। সুখে আছি, সুখে আছি (মিশ্র কীর্তন)

৪। গহনকুসুম কুঞ্জমাঝে (মিশ্র কীর্তন)

৫। তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে

রামপ্রসাদী সুরে—

১। শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা

২। আমিই শুধু রইনু বাকি

৩। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে…ইত্যাদি।

সারি গানের ঢঙে 'এবার তোর মরা গাঙে' গানটিতে সুর বেঁধেছেন কবি।

এর পর কবির বাউল ঢঙের গানের কথা উল্লেখ করছি। বাউল গানের বিষয় ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কবি-রচিত বাউল গান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি। বাউল গানের পেছনে কবি-জীবনের একটা অভিজ্ঞতা আছে। প্রথম জীবনে জমিদারীর কাজ উপলক্ষ্যে শিলাইদহে বাস কালে কবি কুষ্টিয়ায় সেই সময়ের বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের সংস্পর্শে আসেন এবং লালন ফকিরের গান তাঁকে মুগ্ধ করে। বাউল গান যে কবি-মনকে কতখানি আকর্ষণ করেছিল কবির নিজের কথাতেই তার প্রকাশ দেখা যায়—"আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"

বাউল বলতে কী বোঝায় আর বাউল গানই বা কী বস্তু এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে, তবে বাউল গান ও বাউল সাধনা সম্পর্কে পূর্বেই এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তা থেকে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা ধারণা হতে পারে। লালন ফকিরের গান ছাড়াও শান্তিনিকেতনের ছায়াচ্ছন্ন শান্ত পল্লী-পরিবেশ ও বীরভূমের বাউল সম্প্রদায়ের গান কবিকে প্রভাবিত করেছিল। এ যুগের বিখ্যাত বাউল শিল্পী পূর্ণদাসের পিতা নবনীদাস বাউল শান্তিনিকেতনে

প্রায়ই যেতেন। উত্তরবঙ্গের বাউল গানকেও কবি গ্রহণ করেছিলেন। কবির কয়েকটি সুপরিচিত বাউল গানের উল্লেখ করছি, যেমন—

১। আমার সোনার বাংলা
২। ও আমার দেশের মাটি
৩। সার্থক জনম আমার
৪। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি…ইত্যাদি।

সুর সংযোজনা ছাড়া তালসৃষ্টির ক্ষেত্রেও কবির নিজস্ব অবদান আছে। গতানুগতিক তালের পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে কবি নিজে কতকগুলি তাল সৃষ্টি করেছেন, যেমন—ষষ্ঠীতাল, ঝম্পক, নবতাল, একাদশী, রূপকড়া, নবপঞ্চক ইত্যাদি।

ষষ্ঠীতাল— ৬ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬
শ্যা	—	ম	—	ল	—
ছা	—	য়া	—	—	—

ঝম্পক তাল— ১০ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
এ	ই	ল	ভি	নু	স	ং	গ	ত	ব
সু	ন	দ	র	হে	সু	ন্	দ	র	—

নবতাল— ৯ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
নি	বি	ড়	ঘ	ন	আঁ	—	ধা	রে
জ্ব	লি	ছে	ধ্রু	ব	তা	—	রা	—

একাদশী তাল— ১১ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
দু	য়া	রে	দা	ও	মো	রে	রা	—	খি	য়া

রূপকড়া— ৮ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ও	ই	রে	ত	—	রী	—	—
দি	—	ল	খু	—	লে	—	—

নবপঞ্চক তাল— ১৮ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
জ	ন	নী	—	তো	মা	—	রঁ	ক	রু	ণ	চ	র	ণ

১৫	১৬	১৭	১৮
খা	—	—	নি

—এই তালটি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে সুপ্রচলিত।

যে গানে যে রকম তাল প্রযোজ্য রবীন্দ্রনাথ সে রকম তালে সে রকম গান বেঁধে দিয়েছেন। কবির তাল সৃষ্টির মধ্যে অভিনবত্ব আছে।

রবীন্দ্রনাথের সুরে প্রভাবিত হয়ে কেহ কেহ ঐ ঢঙে নিজেদের গানে সুর যোজনা করেছেন। কলিকাতা ও বোম্বাই শহরের বিখ্যাত সুরকাররা কবির গানের সুরকে আশ্রয় করে নিজেদের গানে তা প্রয়োগ করেছেন।

নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত চিত্র 'উদয়ের পথে'। এই চিত্রে দুটি গানের মধ্যে কবিগুরুর সুর গ্রহণ করা হয়েছে এবং দুটি গানই সে সময় জনপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে একটি গান হল—'তোমার বাঁধন খুলতে লাগে' এবং অপরটি হল—'গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই।' এ ছাড়া নিউ থিয়েটার্সের অপর একটি চিত্র 'মন্ত্রমুগ্ধ'তেও একটি গানে কবিগুরুর সুর গ্রহণ করা হয়েছে। গানটি হল—'তোমায় রাঙাব হাসির রঙে।' এ গানটিতে কবিগুরুর 'ওগো শোনো কে বাজায়' গানটির সুর গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কবিগুরুর সুরটি হুবহু নকল না করে একটু হেরফের করা হয়েছে।

বোম্বাই-এর একটি বিখ্যাত হিন্দী ছবিতে একটি বিখ্যাত গান 'বচপন কে দিন ভুলা না দেনা'। এই গানটির সুর কবিগুরুর 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' গানটির সুর থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ভাবে কবির গান বহু গুণীজনের অন্তরকে স্পর্শ করেছে, এবং তার প্রভাব তাঁরা এড়াতে পারেননি।

রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে কথা মনে পড়ে তা হল এখানে গান অনেক সময় ভাষা-প্রধান অথবা সুর-প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে ভাষা ও সুরের অপূর্ব সংমিশ্রণ। যে ভাষার সঙ্গে যে রকম সুরের ভাল মিল হয় কবি ঠিক সেই ভাষায় সেই সুর যোজনা করেছেন। তাঁর গানে কথা ও সুরের গঙ্গা-যমুনা সম্মিলন ঘটেছে। তাই রবীন্দ্র-সংগীত আজ সর্বজনসমাদৃত।

রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন-কালে গায়ক অথবা গায়িকাকে গানের বাণী স্পষ্ট

করে উচ্চারণ করতে হবে—বাণী-উপযোগী দরদ দিয়ে ঠিকমত তাল ও লয় সহযোগে পরিবেশন করলে রবীন্দ্র-সংগীত সুখশ্রাব্য হয়। রবীন্দ্র-সংগীত-শিল্পীদের মধ্যে অনেকের উচ্চারণের অস্পষ্টতা দেখা যায় আর এই অস্পষ্টতার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই গান শ্রোতাদের কাছে তাদৃশ চিত্তাকর্ষক হয় না। স্পষ্ট উচ্চারণে বাণীর যথার্থ অর্থবোধ সহ রবীন্দ্র-সংগীত গাইলে তার আবেদন অপ্রতিরোধ্য না হয়েই পারে না।

রবীন্দ্র-সংগীতের সুর পরিবর্তন বিষয়ে কিছু বলা দরকার। পূর্বে গ্রামোফোন রেকর্ডে যে সমস্ত রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশিত হয়েছে, সে সমস্ত গান বর্তমানে নতুন ভাবে নতুন রূপে অনেক শিল্পী গেয়ে থাকেন। স্বরলিপির মধ্যেও কোন কোন গানের কিছু পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন শিল্পী শ্রীমতী সাহানাদেবী 'আকাশবাণী'র মাধ্যমে বলেছেন যে, তাঁরা সেকালে যে ভাবে যে গান পরিবেশন করতেন, বর্তমানে তার রূপ অনেক বদলে গেছে। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেকার রেকর্ডগুলির কথা স্মরণ করতে পারি। শ্রীমতী কনক বিশ্বাস (দাস), শ্রীমতী সাহানাদেবীদের মতো পুরানো শিল্পীদের রেকর্ডের গানগুলি শুনলে বুঝতে পারা যায় বর্তমানের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কত।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, পৃথিবীতে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। তবে রবীন্দ্রনাথ-সংযোজিত সুরের পরিবর্তন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ এতে রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়। অনেকে স্বরলিপি ঠিক মতো অনুসরণ না করে নিজ ইচ্ছানুযায়ী গান গেয়ে থাকেন—এতে কবির গানের ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং রবীন্দ্র-সংগীত-বিশেষজ্ঞদের এ বিষয়ে খুবই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

সর্বশেষে বলব যে, রবীন্দ্র-সংগীত আজ ভারতের সর্বত্র বিশেষ ভাবে সম্মানিত এবং এ সংগীত ভারতের সংগীত-ভাণ্ডারকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এমন কি ভারতের বাইরে সুদূর ইউরোপেও 'Tagore Song'-এর বিশেষ সমাদর। কি ভাষায়, কি ভাবে, কি সুরে, কি ছন্দে সব দিক দিয়েই রবীন্দ্র-সংগীত রবীন্দ্রনাথের অভিনব সৃষ্টি।

জাতীয় জীবনে স্বদেশী সংগীতের প্রভাব

সংগীতের বিভিন্ন ধারার মধ্যে স্বদেশী সংগীত একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। স্বদেশী সংগীত বলতে সেই সংগীতকে বোঝায়, যা নিজ দেশের বিচিত্র গৌরবময় ঐতিহ্য, স্বাধীনতার কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সুখ-দুঃখ বোধ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে রচিত গান। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বদেশী সংগীতের ধারা বয়ে চলেছে।

বিগত কালে মোগলের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপ সিংহ যখন যুদ্ধ করেছিলেন তখন রাজপুত চারণকবিরা নিজ দেশের বীর যোদ্ধাগণের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে গান রচনা করে গেয়েছেন এবং সে সব সংগীত সমগ্র জাতির মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং জাতির মন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

পরবর্তীকালেও দেখা যায় আমাদের দেশে রঙ্গলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, চারণকবি মুকুন্দ দাস, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবি ও গীতিকারগণ বহু স্বদেশী সংগীত রচনা করেছেন। এঁদের রচিত স্বদেশী সংগীত-জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছে এবং বাঙালীর মনে দেশাত্মবোধ, জাতিপ্রীতিবোধ উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। বর্তমানেও কয়েকজন কবি স্বদেশী সংগীত রচনা করেছেন, তবে উল্লিখিত রচয়িতাগণের রচনার সঙ্গে এঁদের রচনার পার্থক্য অনেকখানি। পূর্বোক্ত কবিদের ভাষা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ, কিন্তু এ যুগের স্বদেশী গানের ভাষার মধ্যে তাদৃশ বলিষ্ঠতা চোখে পড়ে না। দুই যুগের স্বদেশী গানের এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে সে যুগের মানুষের মনের বেদনা-বোধ। দেশ তখন ছিল পরাধীন আর সেই পরাধীনতার বেদনা সে যুগের কবিদের মন ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল যার প্রভাবে তাঁদের মনে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। তাই তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে বলিষ্ঠ ভাব ও ভাষা। কিন্তু বর্তমানে দেশ স্বাধীন হয়েছে আর স্বাধীন দেশের জনসাধারণের মনে পূর্বেকার সেই বেদনা-বোধ নেই, তাই তাঁদের গানের মধ্যেও পূর্বেকার ভাব ও ভাষা প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক, বিভিন্ন কবির রচিত স্বদেশী সংগীত সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করছি।

স্বদেশী সংগীতের ক্ষেত্রে প্রথমে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করছি। দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন তিনি দাসত্বশৃঙ্খলকে ছিন্ন করে স্বাধীন ভাবে বাঁচবার স্বপ্ন দেখেছিলেন আর উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।'...

এর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত স্বদেশী গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।'...

সত্যেন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী গানের উদাহরণ—

'মিলে সবে ভারত সন্তান—
এক তান এক মন প্রাণ।'...

স্বদেশী গানের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ পাদে এ গান জাতির মনে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—সারা দেশ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দেশাত্মবোধক বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এর জন্য 'বন্দেমাতরম্' সংগীত রচনা করেছিলেন। তিনি উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত আনন্দমঠে দেশাত্মবোধের মহাকাব্য সৃষ্টি করলেন। সে যুগে দেশমাতার সেবায় যাঁরাই আত্মনিয়োগ করতেন তাঁদেরই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হত। বিপ্লবীদের কাছে এ গান ছিল বেদমন্ত্র-স্বরূপ। এ সংগীতের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতমাতাকে বন্দনা করেছেন—

'বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।'...

এরূপ ঐকান্তিক ভক্তির আবেগ-মিশ্রিত মাতৃবন্দনা অপর কোন কবির দ্বারা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। শ্রীঅরবিন্দ এই সংগীতকে শ্রদ্ধায়

সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এ সংগীত আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কত কত তরুণপ্রাণ দেশকর্মী বীর যে এই গান কণ্ঠে নিয়ে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদদের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা মূলত এই গানের বাণী থেকেই এসেছিল এ কথা বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না।

এর পর ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ দাস রচিত স্বদেশী গান—

'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এদেশ তোদের নয়।
এই যমুনা গঙ্গা নদী তোদের ইহা হতো যদি
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়।'· ·

এ ধরনের স্বদেশী সংগীত জনসাধারণের মনে জাতীয়তা বোধ উদ্বুদ্ধ করতে প্রচুর সাহায্য করেছে।

স্বদেশী সংগীত বিংশ শতাব্দীর যুব সমাজের মনেও বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলেছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে। যুব সমাজের মনে সেদিন স্বাধীনতার স্বপ্ন জেগে উঠেছিল এবং তার শক্তি কালক্রমে এত প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে ইংরেজের শেষ পর্যন্ত এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

স্বদেশী সংগীত রচনাকালে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—কোন কোন কবি দেশমাতাকে বন্দনা করেছেন, কেউ বা জনগণের উদ্দেশ্যে দেশমাতার আকুল আহ্বানকে ভাষা দিয়েছেন তাঁদের গানে, কেউ বা জনসমাজকে এগিয়ে চলার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন গানের বাণীতে, আবার কোন কোন কবি কারাবাসে বন্দী থেকেও পরাধীনতার মর্মজ্বালার বিরুদ্ধে উদ্দীপক বিদ্রোহ-সংগীত রচনা করেছেন।

স্বদেশী সংগীতের প্রভাবের কথা বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান-গুলিকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, এখানে আরও কতকাংশ যোগ করা হচ্ছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়। ইংরেজ সরকার অবিভক্ত বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে বাংলার শক্তিকে দুর্বল করতে চেষ্টা করলেন। কবি তখন ভাঙা দেশকে জোড়া দেবার অভিপ্রায়ে ইংরেজের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মেতে উঠলেন আর অজস্র স্বদেশী গান প্রণয়ন করে দেশবাসীর স্বদেশপ্রেমকে জাগ্রত করলেন। তিনি 'রাখীবন্ধন' উৎসবের সূচনা করলেন

এবং শোভাযাত্রা করে সবাইকে নিয়ে নিম্নবর্তী গানটি গাইতে গাইতে চললেন—

'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।'

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে রচিত অন্য একটি গানে কবি গাইলেন—

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥'…

কবি সবাইকে নিয়ে রাজপথে এ সব গান গাইতে গাইতে চললেন এবং দেশবাসীকে একতাবদ্ধ হবার জন্য আবেদন জানালেন। তিনি গেয়ে উঠলেন—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।'…

রবীন্দ্রনাথের আর একটি স্বদেশী গানের উল্লেখ করা হচ্ছে—

'এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা, হাতে হাতে ধর্ গো,
আজ আপন পথে চলতে হবে, সামনে মিলনস্বর্গ।'…

এইরূপে ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে তিনি দেশবাসীর অন্তরে পরশাসনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ-চেতনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত করতে বাধ্য হলেন। এখানে স্বদেশী সংগীতের অমোঘ শক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্র-রচিত স্বদেশী সংগীতের কথা বলে শেষ করা যায় না। এ সমস্ত সংগীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে দেশাত্মিকা বুদ্ধির জাগরণ ঘটেছিল—দেশ মুক্তি কামনায় মেতে উঠেছিল। স্বদেশী সংগীত জাতির মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল পরবর্তীকালীন জাতীয় সংগ্রামের ধারা থেকে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের পর এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম স্মরণ করতে হয়। তাঁর বিখ্যাত দুটি স্বদেশী গানের উল্লেখ করা হল—

(১) 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা।'…

(২) 'বঙ্গ আমার জননী আমার
ধাত্রী আমার আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।'…

এ সব সংগীত একদা জাতীয় জীবনে নব উদ্দীপনা ও নবজাগরণ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের পর কবি রজনীকান্ত সেন তার একজন সার্থক স্বদেশী গানের স্রষ্টা। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গানের প্রথম দুই লাইন—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।'…

এখানে কবি দেশবাসীর উদ্দেশে বলতে চেয়েছেন যে, আমাদের দেশমাতার দান সব সময়ই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবো, তা সে বস্তু যেমনই হোক না কেন—কারণ দেশমাতার দান হল আশীর্বাদ।

দেশ পরাধীন থাকা কালে জাতীয় নেতৃবর্গের কণ্ঠে স্বভাবতই বিদেশী বর্জনের ডাক উচ্চারিত হয়েছিল। দেশ জুড়ে তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছে—বিলিতি বয়কট আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বক্তৃতা দিয়ে যে প্রেরণা জাগানো সম্ভব হয় না, গানের মধ্য দিয়ে সহজেই সে প্রেরণা জাগিয়ে তোলা চলে। চারণকবি মুকুন্দদাস তাঁর সংগীতের মধ্য দিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন—

'ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না,
জাগো গো ও জননী, ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না।'…

এ গান শোনবার পর শত শত নারী ও যুবতী তাঁদের রেশমী চুড়ি ভেঙে ফেলেছিল। বিদেশী কাপড় জামা অগ্নিতে ভস্মীভূত করে পরাধীনতার অন্যতম কলঙ্ক-লাঞ্ছন দূর করা হল। দেশের নরনারীরা বিদেশী কাপড় ছেড়ে খদ্দর পরতে আরম্ভ করলেন। এখানে স্বদেশী সংগীতের প্রভাব লক্ষণীয়।

এর পর কবি অতুলপ্রসাদ-রচিত স্বদেশী সংগীতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—

'বল বল বল সবে শতবীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'…

অতুলপ্রসাদের এ উক্তি পরবর্তীকালে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ভারত জগৎসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে।

এর পরই বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কারাবাসে থাকাকালীন উদাত্তকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল্ কর্‌রে লোপাট,
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস -নিশান উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি॥'...

এ গানের মাধ্যমে কবি দেশের তরুণদের মনে ভাঙনের উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন। বিদ্রোহী কবি দেশের জনগণকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে গেয়ে উঠলেন—

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার।'...

কবি এখানে দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়ে বলেছেন যে, তাদের যাত্রা-পথ অত্যন্ত কঠিন, অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল, তাই খুব হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে কোন বিঘ্ন এলে তাকে অতিক্রম করে যাত্রা সফল করে তুলতে হবে।

এভাবে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাবের স্বদেশী সংগীত রচনা করে জাতীয় মানসকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। স্বদেশী সংগীত কেবলমাত্র সঙ্গীত নয়—এর মধ্যে রয়েছে এক অভাবনীয় প্রেরণা, যে প্রেরণা বাঙ্গালী জাতির মনে নব উদ্দীপনা ও নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিল আর এই নবজাগরণই একদিন বাঙ্গালী জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করে স্বাধীন হবার বল যুগিয়েছিল। সংগীতের প্রধান অঙ্গ হল বাণী ও সুর। বাণীর ভিতর শক্তি না থাকলে সাধারণের মনে দেশপ্রেম উদ্বোধিত হয় না। উল্লিখিত কবিদের ভাষা ছিল মর্মস্পর্শী, তাই তাঁদের গান সাধারণ মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছিল। এ সমস্ত গান বাঙ্গালী কোনদিন ভুলবে না। এমনকি, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলা যায় যে, ভাবীকালের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালীর মনেও এসব গান গভীর রেখাপাত করবে। বর্তমানে যে সব কবি এই জাতীয় সংগীত রচনা

করছেন তা ঠিক স্বদেশী সংগীতের পর্যায়ে পড়ে না। কেন পড়ে না তার হেতু পূর্বেই নির্দেশ করা হয়েছে।

উপসংহারে আলোচনার সূত্র-সংক্ষেপ করে বলা চলে যে, রঙ্গলাল থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, গোবিন্দদাস, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল; রজনীকান্ত, মুকুন্দদাস, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ইসলাম প্রমুখ যে সব কবি ও গীতিকার স্বদেশী সংগীত রচনা করে গেছেন তা জাতীয় জীবনের গভীরে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে এবং জাতির মনে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করতে প্রভূত সাহায্য করেছে। সর্বশেষে কবিগুরু-রচিত ভারতের জাতীয় সংগীতের উচ্চারণ দিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনার শেষ করি—

'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥'···

গুরু নানক

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। সে সমস্ত বড় সাধকের ন্যায় গুরু নানকও একজন বড় সাধক। অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত নানকের কণ্ঠে যে সুমধুর বাণী নিঃসৃত হয়েছিল তা পরবর্তীকালে 'নানকের ভজন' নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে।

নানকের পিতা কালুবেদী ও মা তৃপ্তার তত্ত্বাবধানে নানক বড় হয়ে উঠেছিলেন। তবে ছেলেবেলা থেকেই নানকের প্রচলিত লেখাপড়ায় তেমন মন ছিল না আর তাঁর মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না। সংসারের কোন কাজকর্মেই তাঁকে পাওয়া যেত না। তাঁর ঔদাসীন্যের দরুন তাঁর পিতামাতা ধরেবেঁধে তাঁর বিবাহ দেন। উদ্দেশ্য, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার ফলে যদি সন্তানের সাংসারিক বিতৃষ্ণার ভাব কেটে যায়, গৃহী জীবনে মন বসে। কিন্তু বিবাহের পরও তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। নানকের মধ্যে বাল্য থেকেই যে ঐশী ভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল তা তাঁর পিতামাতা বুঝতে পারেননি। কিন্তু সেখানকার মুসলমান জমিদার রায় বুলারের চোখকে তা ফাঁকি দিতে পারেনি।

নানক ধর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন উদার। তিনি পথে-প্রান্তরে, শ্মশানে, উপবনে ঘুরে বেড়াতেন আর নিজ উপলব্ধ সত্যের বাণী প্রচার করতেন। এই সত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনি যে সমস্ত আধ্যাত্মিক ভাব ব্যক্ত করেছেন, তা পরবর্তীকালে নানকের ভজনাবলী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। নানকের একজন মুসলমান ভক্ত ছিলেন—তার নাম মর্দানা। তিনি নানকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন আর নানকের ভজনগীতের সঙ্গে রবাব যন্ত্র বাজাতেন। নানককে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত যে তিনি কোন্ মঠের অন্তর্গত তাতে তিনি উত্তর দিতেন যে, তিনি নানক নিরহংকারী। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোন ভেদ নেই—উচু-নীচুর কোন ভেদ নেই। তাঁর মতে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। যে যেভাবেই ঈশ্বরকে ভজনা করুক প্রত্যেকেরই পূজা একই ঈশ্বরের চরণপ্রান্তে উপনীত হয়। নানক বলেছেন—

'যো এক নীর হ্যায় গঙ্গাজী
এক নাম হ্যায় রাম

এক চাঁদ হ্যায় এক স্বরজ
নির্বল কে বল রাম।'…

অর্থাৎ, রাম নামই হল সার বস্তু—এই নামের মধ্য দিয়েই সব কিছু উপলব্ধি করা যায়।

নানকের জীবনে নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ চোখে পড়ে। কথিত আছে একবার তাঁর এক ভক্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পান করবার অভিপ্রায় জানান এবং সেই ভক্তকে একটু দূরে গিয়ে জলের সন্ধান করতে বলেন নানক। সেই ভক্ত প্রথমে গিয়ে কোন জলাশয় না দেখতে পেয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। নানক তাঁকে বলেন ভগবানের নাম স্মরণ করে সেখানে আবার যেতে। তখন সেই ভক্ত ইষ্টনাম স্মরণ করে সেখানে গিয়ে প্রচুর জল দেখতে পান এবং জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেন। নানক ভক্তদের এ কথাই বলেছেন যে, সর্বশক্তিমান সেই পরমপুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করলে, তাঁর উপর নির্ভর করলে, সব কিছুই পাওয়া যায় সহজে।

নানক ভজন গান গেয়ে নানা জায়গায় পর্যটন করতে লাগলেন। দলে দলে মানুষ তাঁর ভক্তমণ্ডলীতে যোগ দিল। নানকের ভজন গান ছিল ভক্তদের এক প্রধান আকর্ষণ। ঐশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নানক যে সব ভজন করতেন তা 'জপজী' নামক গ্রন্থে সংবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই সব 'ভজন' আমাদের দেশের এক গর্বের বস্তু।

ভগবৎকৃপা লাভ করবার একমাত্র উপায় অলথ্ পুরুষের নাম জপ। নানকের দোহায় এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে এইরূপে—

'কূপ নীর বিনা ধেনু ছির বিনা
মন্দির দীপ বিনা
জ্যায়সে তরুবর ফল বিন হীনা
ত্যায়সে প্রাণী হরিনাম বিনা'…

অর্থাৎ, জলবিহীন কূপ, দুগ্ধবিহীন ধেনু, দীপবিহীন মন্দির, ফলবিহীন বৃক্ষ যেমন বাস্তব জীবনে অর্থহীন হয়ে পড়ে, তেমনই জগতের প্রাণীও হরিনাম ভিন্ন বেঁচে থাকতে পারে না—ইষ্টনাম ভিন্ন মনুষ্যদেহ কোন কাজে লাগে না।

অপর একটি গানে নানক গাইছেন—

'কহে নানকশা বিন ভগবন্তা

ইয়া জগমে নহি কোই আপনা

হরিনাম বিনা।'...

এখানে নানক বলছেন যে, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন এ জগতে আপনার বলতে কেউ নেই—হরিনামই হল জগতের একমাত্র সার বস্তু।

'দেহ নয়ন বিন রয়ন চন্দ্র বিন

ধরতী মেহ বিহীনা

জ্যায়সে পণ্ডিত বেদ বিন হীনা

ত্যায়সে প্রাণী হরিনাম বিনা।'...

অর্থাৎ, নয়ন ভিন্ন দেহ, চন্দ্র ভিন্ন রাত্রি, মেঘবিহীন ধরিত্রী আর বেদবিহীন পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন অকেজো, তেমনই ইষ্টনাম-বিহীন মানুষ নিষ্ফল।

'নানক গাবী ঐ গুণী নিধানু

গাবী ঐ সুনী ঐ মণিরথী ঐ ভাউ

দুখ্ পরিহার সুখ ঘরিলৈ নাই॥'...

অর্থাৎ নানক বলছেন, সেই গুণনিধান পরমপ্রভুর স্তুতি গান কর—তাঁর গুণ কর গান, তাঁর গুণ কর শ্রবণ, তাহলেই দুঃখকে পরিহার করে সুখ নিয়ে যেতে পারবে ঘরে।

নানক এই ভাবে তাঁর ধর্মের উপলব্ধিসমূহকে গ্রথিত করে যে সব ভজন রচনা করেছেন তা আমাদের সংগীত-ভাণ্ডারের অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে। আজও নানকের ভজন শ্রোতৃবৃন্দকে ভাবসাগরে নিমজ্জিত করে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গুরু নানকের ভজনাবলীর সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হিমালয় ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তিনি যখন পাঞ্জাবে যান তখন অমৃতসরেও গিয়েছিলেন এবং সেই সুযোগে শিখদের প্রধান তীর্থস্থল 'স্বর্ণমন্দির' পরিদর্শন করেন। স্বর্ণমন্দিরে শিখ ভক্তদের পাশে বসে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানকের ভজনগীত শুনে কাটাতেন এবং ওই গীতলহরী শ্রবণে তাঁর অন্তরে এক অপূর্ব ভক্তিভাবের আবেশ হতো। সেই ভক্তিবিহ্বলতার কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

নানক রচিত ভজনগীতাবলীর মধ্যে এই গানটি মহর্ষিদেবের সবচেয়ে প্রিয় ছিল—

'গগনময় থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে

তারক-মণ্ডলা জনক মোতি।

ধূপ মলয়ানিলো, পব্‌ন্‌ চবঁ্‌রো করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
কঁয়সী আরতি হোবে ভবখণ্ডনা তেরী আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।'...

রবীন্দ্রনাথ এই গানটির তর্জমা করেছেন এই ভাষায়—

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকমণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতিরে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥'...

ভক্ত কবীর

বারাণসীর এক দরিদ্র মুসলমান জোলার ঘরে কবীর দাসের জন্ম। নিরক্ষর, অর্থ-সংস্থানহীন এক পরিবারকে নির্ভর করতে হয় বস্ত্র বয়নের উপর। পিতা নিরু ও জননী নীমা একান্তভাবে চান যে তাদের পুত্র পৈতৃক বৃত্তি গ্রহণ করুক।

কিন্তু কবীরকে নিয়ে পেরে ওঠা দায়। তিনি স্বভাবতই খুব উদাসীন আর সংসারের কোন কাজেই তাঁর মন বসে না। তিনি সব সময় কোন ফকির বা সাধুর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ান এবং এ ভাবেই তাঁর দিনরাত কোথা দিয়ে কেমন ভাবে কেটে যায় তা তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না। পুত্রের এরূপ মনোভাবে পিতামাতা শঙ্কিত, কারণ এই পুত্র এভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে চললে বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের কে দেখবে?

কবীরের পূর্বাগতরা মাত্র দুই-তিন পুরুষ আগে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কাজেই পূর্বের আচার, সংস্কার ও সাধনার ঐতিহ্য তাঁর রক্তের মধ্যে ক্ষীণধারায় হলেও বহমান ছিল। বারাণসীতে হিন্দু সাধুসন্তদের বাস— এখানে তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষদের আনাগোনা সব সময়, তাই কবীর স্থির করলেন

এঁদের কারুর কাছ থেকে তিনি দীক্ষা নেবেন। কিন্তু দীক্ষার পথে অন্তরায়, তিনি মুসলমান। ভাগ্যক্রমে একদিন গঙ্গার ঘাটে আচার্য রামানন্দের সঙ্গে কবীরের সাক্ষাৎ হয় এবং কবীর দাস তাঁকে জানালেন—"প্রভু, আমি আপনার অনুগৃহীত শিষ্য।"

"সে কি কথা, আমি ত তোমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিনি।"

কবীর দাস বললেন—"নিতান্ত দরিদ্র জোলার ঘরে জন্ম আমার, আমার নাম কবীর দাস—আপনার কৃপায়, আপনার পবিত্র দেহস্পর্শ দিয়ে যে-নাম-দীক্ষা আপনি দিবেন সেই হবে আমার পাথেয়। এ অধমকে আপনি স্থান দিন আর আশীর্বাদ করুন, প্রভু।"

রামানন্দ তরুণের দিকে বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলেন।

রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য এই রামানন্দ স্বামী। কবীর দাস শুনেছেন যে, অন্যান্য আচার্যদের অপেক্ষা রামানন্দ অনেক বেশী উদার। কবীরের ভয় যদি আচার্য তাঁকে উপেক্ষা করেন। তাই তিনি অদ্ভুতভাবে গঙ্গার ঘাটে সেদিন দীক্ষা নিলেন।

রামমন্ত্র গ্রহণ করে কবীর দাস ঘরে ফিরে গেলেন। কোন কাজেই তাঁর আর উৎসাহ রইল না, আকর্ষণ রইল না। বৃদ্ধ পিতামাতা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

তাঁত-ঘরে গিয়ে কবীর যখন কাজ করতে বসেন হাতের মাকু হাতেই থেকে যায় আর টানাপোড়েনের সুতো ছিঁড়ে গিয়ে বয়নকার্য পণ্ড হয়। হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি গেয়ে ওঠেন—

'দীনদয়াল ভরোসে তেরে
সভ পরবারু—চঢাইয়া বেড়ে।'…

অর্থাৎ, হে আমার দীনদয়াল, তোমার উপরই যে আমার ভরসা। আমার সারা পরিবারকে তোমার নৌকায় চড়িয়ে দিলাম, প্রভু।

এভাবে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে কবীর দাস তাঁর সাধনা শুরু করলেন এবং ধীরে ধীরে সাধনার পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। কবীরের এরকম মনের অবস্থা দেখে তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা জোর করে তাঁকে বিবাহ দেন যাতে ছেলের মনে সংসার সম্পর্কে একটা দায়িত্ববোধ জন্মায়। কিন্তু কবীরের অন্তরে তখন বয়ে চলেছে রাম নামের ভাবস্রোত, তাই পিতামাতার স্নেহ, পত্নীর প্রেম, সংসারের কোন বন্ধনই তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। একটা ভাবোন্মাদ অবস্থায় তাঁর দিন কাটতে লাগল।

কবীরের সাধনার মূল কথা হচ্ছে—নাম জপা, ভজন করা এবং সেবাধর্ম গ্রহণ। তিনি ভজনের মধ্য দিয়েই সাধনা করেছেন। তাঁর ভজন ছিল অপূর্ব—ভজনের প্রত্যেকটি বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি ধর্মের মূল কথা ব্যক্ত করেছেন। ব্রাহ্মণের বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানকে পরিহাস করে তিনি বলেছেন—

'মালা ফেরত জনম গয়া, গয়া ন মনকা ফের।
করকা মালা ছোড়কে মনকা মালা ফের।'...

অর্থাৎ, মালা ফেরাতে ফেরাতে তোমার এ জন্ম প্রায় কেটে গেল, মনের দ্বিধা সন্দেহ তবু গেল না। ওগো এবার থেকে মনের মালাটি ফেরাও।

সন্ন্যাসী-যোগীদের উপহাস করে বলেছেন—

'মন না রগাঁয়ে
রগাঁয়ে যোগী কপড়া,
আসন মাড়ি মন্দিরমে বৈঠে
ব্রহ্ম ছাড়ি পূজন লাগে পথরা।'...

অর্থাৎ, হে যোগী, মন না রাঙায়ে তুমি কাপড় রাঙিয়েছ। আসন করে মন্দিরে বসেছ আর পূজা করছ পাথরকে।

এভাবে তিনি বহু ভজন রচনা করেছেন যার মধ্য দিয়ে অনেক গভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ পেয়েছে।

রামমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবীর দাসের অন্তর্জীবনের কপাটটি খুলে যায়। তিনি রাম নামরসে ডুবে এক ভাবুক সাধকে পরিণত হয়ে গেয়ে ওঠেন—

'কো বীনৈ প্রেম লাগো বী মাঈ কো বীনৈ
রাম-রসায়ন মাতে বী মাঈ, কো বী নৈ।"...

অর্থাৎ, মাগো, আমি প্রেমে পাগল হয়েছি, এখন কাপড় বুনবে কে? মাগো, আমি রাম-রসায়ন পান করে একেবারে মত্ত হয়ে গেছি, কাপড় বুনবে কে?

এই রামনামের রসায়নই কবীরকে উত্তরকালে এক সিদ্ধ সাধকে পরিণত করে। কেবলমাত্র রামনাম নয়, হরি, গোবিন্দ, কেশব, সাহিব প্রভৃতি নানা নামে তিনি তাঁর প্রভুকে ডেকেছেন। সাধনা করতে করতে কবীর দাস এমন স্তরে পৌঁছালেন যখন তাঁর বিরহী চিত্ত পরমবস্তুর জন্য নিতান্ত আকুল হয়ে উঠল। তখন দিবানিশি নাম গান করে আর দোঁহা ও ভজন গান গেয়ে তাঁর দিন কাটত। এই নিরক্ষর সাধকের রচনায় ধীরে ধীরে অতিশয় গভীর

ভাব-সংকল্প দানা বেঁধে ওঠে। তাঁর ভজনের সুর ও ভাব সমকালীন সাধু-সন্তদের মনেও চমক লাগিয়ে দিতে থাকে। পরম সত্যের বাণী, শাশ্বত জীবনের গূঢ় তত্ত্ব এমন সহজভাবে তাঁর ভজনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে তাতে বিস্মিত হতে হয়। এইরূপে কবীরের সাধনা পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। বহু শিষ্য ও ভক্ত এসে ভীড় করতে থাকে কবীরের পাশে।

কবীর কিন্তু সে সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে এবার তাঁকে এ নরদেহ ছাড়তে হবে। তিনি তখন একান্তে সাধনা করবার জন্য গোরক্ষপুর জেলার মগহর-এর দিকে রওনা হলেন। কিন্তু তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে বারাণসীতে ফিরিয়ে আনবার জন্য সাধ্য-সাধনা করতে লাগল। কবীর তাঁর সংকল্পে অটল, তিনি অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বললেন—

"জস্ কাশী তস মগহর ঊষর
হিরদে রাম সতি হাঈরে।"...

অর্থাৎ, কাশী আর মগহর দুই-ই ঊষর। পরম সত্য বস্তু হচ্ছেন হৃদয়স্থিত রাম। কাজেই কবীরের কাছে কাশী ও মগহর-এর কোন পার্থক্য নেই। এ কথা শোনবার পর তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীদের মধ্যে একটা কান্নার রোল পড়ে গেল। মগহর-এ এক প্রাচীন সাধুর পরিত্যক্ত কুটীরে কবীর তাঁর আসন বিছিয়ে বসলেন। ক্রমশ সেই পরম লগ্নটি এসে পড়ল। অন্তরঙ্গ ভক্তদের ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কবীর দাস দেহরক্ষা করলেও তিনি তাঁর ভজন ও দোঁহার মধ্য দিয়ে আজও অত্যন্ত সজীবভাবে বিরাজমান। কবীরের ভজন আজ সারা ভারতে সমাদৃত। ধূপের গন্ধ যেমন হাওয়ায় ভেসে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে তেমনই কবীরের ভজনের প্রভাবও আজ দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

মীরাবাঈ

নানক, রামানুজ, কবীর, তুলসীদাস ও শ্রীচৈতন্যের মতো মীরাবাঈও উচ্চস্তরের সাধক। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মীরাবাঈ ছিলেন গিরিধারী-লালের উপাসিকা। মীরাবাঈকে নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে।

মীরাবাঈ রাজপুতানার পরম বৈষ্ণব এক রাঠোর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মীরার অন্তরে শিশুকাল থেকেই ভক্তির বীজ লুকায়িত ছিল এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তিবীজ বৃদ্ধি পেয়ে ফুলে-ফলে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

কথিত আছে শিশুকালে কোন বিবাহ উৎসবে 'বর' দেখে মীরা তাঁর মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন—"আমার স্বামী কে?" মা উত্তর দেন—"ঐ গিরিধারীলাল তোমার স্বামী।" মীরার শিশুমনে সেদিন ঐ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং গিরিধারীলালকেই নিজ স্বামী জ্ঞানে মন প্রাণ ঢেলে তাঁর পূজা করতে থাকেন।

মীরার উপাস্য এই গিরিধারীলাল সম্পর্কে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার এক সন্ন্যাসী মীরার পিতৃগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল নারায়ণ শিলা ও গিরিধারীলালের মূর্তি। মীরা তখন চার বৎসরের বালিকা মাত্র। মীরা গিরিধারীর মূর্তিটি নেবার জন্য বায়না ধরলে সন্ন্যাসী তা দিতে অস্বীকার করেন এবং সেখান থেকে চলে যান। কথিত আছে পরে সন্ন্যাসী স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে মীরাকে সেই মূর্তিটি দান করেন। মীরা আজীবন সেই মূর্তি উপাসনা করেছিলেন।

রাজপুতদের মধ্যে বাল্য-বিবাহের প্রচলন ছিল, তাই মীরারও অল্পবয়সে বিবাহ হয়। রাণা কুম্ভের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। মীরা রূপবতী ছিলেন। বিবাহের পর স্বামীর গৃহে গেলেন। তাঁর শ্বশুরকুল ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন শৈব এবং তা থেকেই মীরার জীবনে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। কথিত আছে শ্বশুরকুলের গৃহদেবতাকে প্রণাম করতে মীরা অস্বীকার করেছিলেন এই বলে যে, একমাত্র গিরিধারী ছাড়া আর কাউকে তিনি প্রণাম করবেন না। রাজকুলবধূর এই আচরণে আত্মীয়-পরিজন ক্ষুব্ধ হন। বিবাহের প্রথম দিকে মীরা বিলাসিতার মধ্যে ডুবে ছিলেন কিছুদিনের জন্য, কিন্তু ক্রমেই বিলাস-ব্যসনের প্রতি তাঁর মনে তীব্র অনীহার সৃষ্টি হয়। বিবাহের দশ বৎসর পর মীরা বিধবা হন। স্বামীর মৃত্যুর পর নিজেকে গিরিধারীর চরণে নিঃশেষে সমর্পণ করলেন। তিনি পার্থিব জগতের স্বামীকে হারিয়ে বিশ্বের স্বামীর সন্ধানে চললেন।

মীরার দেবর এসব পছন্দ করতেন না। তিনি নূতন নূতন পরীক্ষা দ্বারা মীরার সাধনার একাগ্রতা যাচাই করতে শুরু করলেন। ফলে মীরাকে শ্বশুর-কুলে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে কেউ ঘরে বেঁধে রাখতে পারল না। বৈষ্ণবের সেবা, গিরিধারীর ভজন ও আরাধনায়

সাধিকার দিন কাটতে লাগল। মীরার কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব—তাঁর ভজন যে শুনেছে সেই মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। ক্রমে তাঁর সাধনার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

রাজকুলবধূর এই সাধুসঙ্গ দেবর সহ্য করতে পারলেন না। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ননদও অনেক বোঝালেন—ভয় দেখালেন, কিন্তু মীরার মন টলাতে কেউ সক্ষম হলেন না। শোনা যায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করবার অভিপ্রায়ে বিষের পাত্র 'হরিচরণামৃত' বলে পান করতে দেওয়া হয়। সেই বিষ মীরার হাতে অমৃত হয়ে গেল। এই ভাবে অনেক অত্যাচার ও দুঃখ-বিপদের মধ্য দিয়ে মীরা সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। মীরা মেবার ত্যাগ করলেন। তিনি পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। ততদিনে তিনি সমস্ত পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করেছেন। তাই তাঁর কণ্ঠে গান ফুটে উঠল—

'মেরে তো গিরিধর গোপাল
দুসর ন কোই।'...

বস্তুতঃ, গৃহত্যাগের পরই মীরার সাধনার যথার্থ শুরু। যাঁর জন্য মীরা গৃহ ছাড়লেন তাঁকে এখনও পাওয়া হয়নি। যাঁর জন্য এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, তিনি আজও তাঁকে দেখা দেননি। তাই মীরা গেয়ে উঠলেন—

'মীরা কো প্রভু সাচী দাসী বনাও।'...

অর্থাৎ, প্রভু, আমাকে তুমি সত্যিকারের দাসী করে নাও।

আর একটি গানের প্রথম দুই ছত্র—

'তুম্হারে কারণ সব সুখ ছোড়্যা
অব ক্যা মুঝে তরসাবো।'...

অর্থাৎ, তোমার জন্য সমস্ত সুখই ত ছেড়েছি, তবে আর কেন দুঃখ দাও। ভক্তির এরকম আন্তরিকতাপূর্ণ অন্তঃস্পর্শী অভিব্যক্তি আর কারও ভজনে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এ অভিব্যক্তি সাধারণ মানুষের মনকেও ব্যাকুল করে তোলে। শ্রীরাধা যেমন কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়ে কুল খুইয়ে বেরিয়েছিলেন, তেমনই মীরাও তাঁর প্রেমের ঠাকুরের জন্য পাগল হয়ে রাজগৃহ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সব পেছনে ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে। তাই ত তিনি গান—

'হে রী মৈ তো প্রেম দিবানী
মেরা দরদ না জানে কোই।'...

মীরা বলছেন—'আমি যে প্রেমে পাগল হয়েছি; আমার দুঃখ কেউ বুঝতে

পারছে না।' এক কথায় বলতে গেলে মীরা গিরিধারীলালের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

'ম্যায়নে চাকর রাখো জী।'...

অর্থাৎ, আমাকে তুমি তোমার চাকর বানিয়ে নাও, প্রভু। আবার অন্তরে যখন গিরিধারীলালের স্পর্শসুখ অনুভব করলেন তখন তিনি আনন্দে 'ঝুরমুট' খেলতে চললেন। বললেন—

'সখী রী মৈ তো গিরিধরকে রংগ রাতী
পাঁচ রংগ মেরা চোলা রংগা দে,
মৈঁ ঝুরমুট খেলন জাতী।'...

অর্থাৎ, আমি গিরিধারীর রঙে রেঙে আছি, আমার শাড়ী পাঁচ রঙে রাঙিয়ে দাও, আমি 'ঝুরমুট' খেলতে যাই। লৌকিক প্রবাদোক্ত 'ঝুরমুট' কথাটার মানে হল বিশ্বদেবতার রাসলীলা।

এরপর মীরা বৃন্দাবনে গেলেন এবং দেবতার সঙ্গে চলল তাঁর নিত্যলীলা —কথিত আছে বৃন্দাবনে পৌঁছাবার পর মীরা বৈষ্ণব ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। কিন্তু বৈষ্ণবের স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করা নিষেধ, তাই রূপ গোস্বামী খবর পাঠালেন যে তিনি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। মীরা তাঁর এই উক্তি শুনে বিস্মিত হলেন এবং বার্তাবাহকের নিকট বললেন, 'আমি জানি বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ হলেন শ্রীকৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি। এক্ষেত্রে আমার সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর বাধা কোথায়?' এ কথা শোনবার পর রূপ গোস্বামী মীরাকে চিনতে পেরেছিলেন।

জীবনের শেষ দিকে মীরা দ্বারকায় যান। এ সময়ে মেবারের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। কথিত আছে তখন মেবার থেকে এক ব্রাহ্মণ দ্বারকায় যান মীরাকে ফিরিয়ে আনতে। মীরা কী করবেন স্থির করতে না পেরে রণছোড়জীর মন্দিরে বসে গাইতে লাগলেন—"সাজন সুধ জ্যো জানো জ্যো লীজা হো।" অর্থাৎ, হে প্রিয়তম, তুমি যদি আমাকে শুদ্ধ মনে কর, তাহলে তোমার কোলে আমাকে স্থান দাও। কিংবদন্তী বলে মীরা ঐ সময়ে রণছোড়জীর মূর্তির মধ্যে মিলিয়ে যান।

মীরা ছিলেন বৈষ্ণব সেবিকা ও সাধিকা। ভজনের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সাধনা করেছেন আর গিরিধারীলালকে অন্তর দিয়ে পূজা করেছেন। নিজের বলতে তাঁর কিছুই ছিল না—সম্পূর্ণভাবে নিজেকে গিরিধারীলালের চরণে

উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে আত্মনিবেদন করেছিলেন। ভগবানে এরকম ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের আকৃতি বিরল। মীরার অন্তরে ভক্তির প্রবাহ যেন নদীস্রোতের মতো বয়ে চলেছিল নিরন্তর, যার জন্য মীরার ভজন আজও সারা ভারতে সর্বজনসমাদৃত। বহু সাধক ভজন রচনা করেছেন কিন্তু মীরাবাঈয়ের ভজনের জাত আলাদা। ঐ গান তার সরল আন্তরিকতার দ্বারা চকিতে অন্তরের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে। তিনি গিরিধারীলালকে যেন একেবারে কাছের মানুষটি করে নিয়েছিলেন—তাঁর সঙ্গেই মীরার যত কথা, যত মান-অভিমান, আবার তাঁকেই অন্তরে উপলব্ধি করে অপার আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়তেন।

মীরার ভজনাবলী ভক্তিরসে সিঞ্চিত এবং এ রস যে আস্বাদন করতে পেরেছে সে-ই আনন্দে বিভোর হয়েছে। মীরার পূজার মধ্যে কোন আড়ম্বর ছিল না। তিনি নিজ অন্তরের সহজ মনোভাব গিরিধারীলালের নিকট ভজনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মীরাবাঈয়ের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে এবং তাঁর ভজন সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। কোনও মতে রাণাকুম্ভের জীবিতকালেই মীরাবাঈ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন, আবার কোনও মতে রাণাকুম্ভের মৃত্যুর পর মীরাবাঈ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তাঁর গিরিধারীলালের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনের পথে পাড়ি জমান।

মীরাবাঈয়ের ভজন সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, 'ষট্‌পন্থী'গণ মীরাবাঈয়ের ছয়টি ভজনকে মীরাবাঈয়ের ভজন বলে মেনে নিয়ে 'ষটকমল' আখ্যা দিয়েছেন। এখানে ষট্‌কমলের ছয়টি ভজনের নাম উল্লেখ করা হল—

(১) স্তয়না লাল চায়ে
(২) তুমহারি কারণ
(৩) শুনি ম্যয় হরি আবান কি আওয়াজ
(৪) চিত নন্দন বিলমাঈ
(৫) ম্যয়নে চাকর রাখোজী
(৬) জীবন মরণ কি সাথী

সন্ত তুলসীদাস

অন্যান্য বড় সাধকের মতো শ্রীতুলসীদাসও একজন বড় সাধক ছিলেন। শ্রীরামজীর উপর তাঁর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। হিন্দী সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ 'রামচরিত মানস' গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। এছাড়াও তিনি বহু দোঁহা ও ভজন রচনা করে গেছেন। তাঁর দোঁহা ও ভজনাবলী ভারতের সংগীত-ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ।

আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রয়াগের বান্দা জেলার রাজপুর গ্রামে তুলসীদাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আত্মারাম দ্বিবেদী ও মাতার নাম হুলসী দেবী। জন্মের কিছুকাল পরেই তিনি পিতৃমাতৃহারা হন। এ কথা তাঁর দোঁহায় পাওয়া গেছে। তিনি লিখেছেন— 'মাতু পিতা জগজয়া তজ্যো'। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর পিতার গুরুদেব নরসিংদাসের আশ্রয়ে তিনি প্রতিপালিত হন। নরসিংদাস তুলসীদাসকে দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা শ্রীমতী রত্নাবলীর সঙ্গে বিবাহ দেন।

ছেলেবেলা থেকেই তুলসীদাস অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন এবং কাব্যে তাঁর অসাধারণ অনুরাগ ছিল। স্ত্রীর প্রতি তাঁর গভীর প্রেম ছিল এবং এই পার্থিব প্রেমই পরে পরিবর্তিত হয়ে ইষ্টলাভের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

তুলসীদাস সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিংবদন্তী এই যে, এক ঝড়-বাদলের দিনে তুলসীদাস কোন কাজ উপলক্ষ্যে দূরে গিয়েছিলেন এবং বাড়ী ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যায়। এদিকে রত্নাও বিশেষ কারণে ঐ দিন পিত্রালয়ে যান। তুলসীদাস বাড়ী ফিরে রত্নাকে না দেখে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করাতে সে জানায় যে রত্না পিত্রালয়ে গেছে। তুলসীদাস সেই ঝড়-জলের মধ্যেই সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হন। এতে রত্না অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, "এই দেহটার প্রতি তোমার যে অনুরাগ তা রামচন্দ্রের চরণে নিবেদন করলে পেতে পারতে সর্বসিদ্ধি।" তুলসীদাস রত্নার এই কথায় খুবই আঘাত পেলেন এবং মোহাবিষ্টের মতো পথে এসে দাঁড়ালেন। এখান থেকেই শুরু হয় তুলসীদাসের জীবনে এক নতুন অধ্যায়। তাঁর চোখের সামনে নবদূর্বাদল শ্যাম শ্রীরঘুনাথের মূর্তি সহসা ভেসে উঠল। তিনি ঐ ঝড়-জলের মধ্যেই পথ চলতে লাগলেন। বহুপথ অতিক্রম করে অনেক কষ্ট

স্বীকার করে কাশীতে এসে পৌছালেন। তাঁর মুখে থেকে থেকে কেবলই ইষ্ট-নাম ধ্বনিত হতে লাগল। এ সময়ে তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন আর শ্রীরঘুনাথজীর নামকীর্তন ও লীলা-বিবরণ পাঠ করতে থাকেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁর কাছে লোকের ভীড় হতে লাগল। তিনি নির্জনে বসে সাধন-ভজন করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

প্রবাদ আছে এই কাশীতেই তিনি শ্রীরঘুনাথজীর দর্শন লাভ করেন শ্রীহনুমানজীর কৃপায়। এরপর বজরঙ্গবলী শ্রীহনুমানজী তুলসীদাসকে চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে সাধন-ভজন করতে আদেশ দেন। তুলসীদাস চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে নদীর ধারে বসে নির্জনে সাধন-ভজন করতে লাগলেন। একদিন তিনি পূজার আয়োজন করে চন্দন ঘসছিলেন এমন সময় এক কিশোর বালক এসে তুলসীদাসের কাছে সেই চন্দন ও ফুল চেয়ে বসল। তুলসীদাস সেই বালকটির কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিয়ে মনে মনে ভাবলেন বালকটি রঘুনাথজী নয় ত? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

'বালক শুনহু বিনয় মম এহুঁ
তুম্ শ্রীরামচন্দ্র কি দুসর কেহুঁ ?'

বালকটি হেসে উঠল এবং চোখের নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। তুলসীদাস জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা বইতে লাগলো। তিনি লিখলেন—

'চিত্রকূট কে ঘাটপর ভাই সন্তন কী ভীড়,
তুলসীদাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর।'

এই ভাবে তুলসীদাস শ্রীরঘুনাথজীর দর্শন লাভ করেন। ভগবদ্‌ভক্তির আকারে তাঁর কণ্ঠ থেকে যে বাণী নিঃসৃত হয়েছিল তা আজ আমাদের সংগীত ভাণ্ডারের এক বিশিষ্ট সম্পদ।

তুলসীদাস প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন এবং পরে শ্রীবিশ্বনাথজীর আদেশে সাধারণের কথ্য ভাষায় অর্থাৎ হিন্দীতে রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণের নামই 'রামচরিতমানস' এবং এই কাব্যই তুলসীদাসের রামায়ণ বলে ভারতজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে।

তুলসীদাস একাধারে কবি, দার্শনিক, ভক্তসাধক ও শক্তিমান যোগী। তাঁর ভজনের মধ্যে এই সমস্ত কিছুরই প্রকাশ ঘটেছে। তুলসীদাস শ্রীরামজীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে স্বীয় মনের আকুতি প্রকাশ করতে

গিয়ে ভাবের আবেগে কণ্ঠ দিয়ে যে বাণী উৎসারিত হয়েছিল, তাই গান হয়ে ফুটে উঠেছে।

তুলসীদাস তাঁর অধ্যাত্মচেতনার মধ্য দিয়ে রঘুনাথজীর কাছে নানাভাবে স্বীয় মনের আকুলতা প্রকাশ করেছেন এবং তা প্রকাশ করতে গিয়ে ভক্তিরসে সিঞ্চিত যে ভাবাবেগ তাঁর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে তাই তাঁর ভজন। তাঁর ভজনে নেই ভাষার আড়ম্বর, নেই কোন ঐশ্বর্যভাব। আছে এমন বস্তু যা মানুষের মনকে টেনে নিয়ে যায় এক অপূর্ব ভাবজগতে।

এ সব ভজনের মধ্যে বিষয়বস্তুরূপে আছে রামজীর নাম জপের কথা আর আছে জগতের সারমর্ম কথা। তুলসীদাস তাঁর একটি ভজনে বলেছেন—

'রাম জপু রাম জপু রাম জপু বাবরে
ঘোর ভব নীর নিধি নাম নিজ নাবরে।'

অর্থাৎ, রামনাম জপ করাই হল প্রধান কথা—এই জপ দ্বারাই ভগবৎকৃপা লাভ করা সম্ভব হয়।

অন্য একটি ভজনে আছে—

'একহি সাধন সব রিদ্ধি সিদ্ধি সাধিরে
গ্রসে কলি রোগ যোগ সংযম সমাধিরে।'

অর্থাৎ, সাধনার এই একটাই পথ যে সংযম দ্বারা সমাধি লাভ করা যায়।

'ভাল যো হ্যায় পোচ যো হ্যায় দাহিন যো বামরে
রাম নাম হি সো অন্ত সবহি কো কাম রে।'

অর্থাৎ, ভাল মন্দ যা কিছু আছে এই পার্থিব জগতে সব কিছুই রামনাম দ্বারা শোধিত হয়।

অন্য একটি ভজনের মাধ্যমে তুলসীদাস পার্থিব জগতের সারমর্ম কথা প্রকাশ করেছেন—

'সাচ্ছা কহে তো মারে লাঠ্যা
ঝুঠে জগত ভুলাই।'

অর্থাৎ, এ জগৎ মিথ্যাকে আশ্রয় করে ভুলে আছে—সত্য কথা বললেই তার বদলে লাঠি খেতে হয়।

এখানে তুলসীদাস জগতের গূঢ় সত্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন তাঁর ভজনের মাধ্যমে। ভক্তিরস-সিঞ্চিত তুলসীদাসের ভজনগুলি লোকের

মুখে মুখে ফেরে। আজও এই ভজনসংগীত পরিবেশন করে শিল্পীরা শ্রোতৃ-বৃন্দকে আনন্দ দান করে থাকেন।

তুলসীদাস ভাবের আবেগে এ সব ভজন রচনা করেছিলেন, তাই এর মধ্যে ধরাবাঁধা রাগ বা তাল পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীকালে এ সকল ভজন রাগ ও তাল সহযোগে গীত হতে থাকে। এই ভজন আমাদের সংগীত-ভাণ্ডারকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালী করেছে।

জীবনের শেষভাগে তুলসীদাস উত্তরকাশী যান এবং সেখানেই মরদেহ ত্যাগ করেন, এরূপ জনশ্রুতি।

পরিশিষ্ট

আকারমাত্রিক স্বরলিপি

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন—এই সাতটি স্বর নিয়ে একটি সপ্তক গঠিত। সাধারণতঃ আমাদের দেশে তিনটি সপ্তক ব্যবহৃত হয়, যেমন—উদারা (নিম্ন), মুদারা (মধ্য) ও তারা (উচ্চ)।

উদারার চিহ্ন—স্, র্, গ্, ম্, প্, ধ্, ন্।

মুদারার চিহ্ন—স, র, গ, ম, প, ধ, ন।

তারার চিহ্ন—র্স, র্র, র্গ, র্ম, র্প, র্ধ, র্ন।

২। উপরে যে স্বরগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি শুদ্ধ স্বর। আর এর মধ্যে ৪টি কোমল ও ১টি কড়ি স্বর আছে—এগুলিকে বিকৃত স্বর বলা হয়ে থাকে। যথা, ঋ, জ্ঞ, দ, ণ (কোমল) ও হ্ম (কড়ি)।

৩। প্রত্যেক Scaleএ কোমল ও কড়ি স্বর নির্ণয় করবার পদ্ধতি এখানে দেওয়া হল—

স ১ র ১ গ½ ম ১ প ১ ধ ১ ন½ র্স।

স এবং র-এর মাঝখানে ১টি পর্দা আছে সেটি কোমল র, র এবং গ-এর মাঝখানে একটি পর্দা আছে সেটি কোমল গ, গ এবং ম-এর মধ্যে কোন পর্দা নেই, ম এবং প-এর মাঝখানে যে পর্দা আছে সেটি কড়ি ম, প এবং ধ-এর মাঝখানে একটি পর্দা আছে সেটি কোমল ধ, ধ এবং ন-এর মাঝখানে একটি পর্দা আছে সেটি কোমল ন, ন এবং র্স-এর মাঝে কোন পর্দা নেই।

কোমল ও কড়ির চিহ্ন—

শুদ্ধ	কোমল	কড়ি
র	ঋ	
গ	জ্ঞ	
ধ	দ	
ন	ণ	
ম	—	হ্ম এইরূপ চিহ্ন হয়।

৪। স্বর উচ্চারণের সময় বা কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে। কয়েকটি মাত্রার সমষ্টিতে একটি তাল হয়। তাল অবশ্য বিভিন্ন রকমের আছে।

৫। মাত্রা= -। (আকার)। যেমন—সা একমাত্রা ; সা-। দুই মাত্রা ; সা-।-। তিন মাত্রা ; ইত্যাদি। এক মাত্রায় দুইটি স্বর থাকলে দুইটি স্বর যুক্ত হয়ে বসে এবং শেষের স্বরে আকার যুক্ত হয়, যেমন—সরা (এক মাত্রায় দুই স্বর), সরগা (এক মাত্রায় তিন স্বর)।

৬। আধমাত্রার চিহ্ন=: ; যেমন—স:, র: ইত্যাদি। কিন্তু দেড় মাত্রার চিহ্ন=সা: অর্থাৎ আকার একমাত্রা আর বিসর্গ আধমাত্রা। সিকি মাত্রার চিহ্ন=॰ ; যেমন স॰, র॰ ইত্যাদি।

৭। একটি স্বর থেকে অন্য স্বরে যাবার সময় যদি কোন স্বরকে স্পর্শ করে যায়, তাকে স্পর্শ স্বর বা 'কন্' বলা হয়। স্পর্শ স্বরটি প্রধান স্বরের উপরে ছোট করে লেখা থাকে, যেমন—সগা। গ স্বরে যাবার সময় স স্বরটি স্পর্শ করে গেছে বুঝতে হবে।

৮। ঝট্কা চিহ্ন= ⁀। কোন স্বরের উপর এইরূপ চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে ঐ স্বরের উপর ঝট্কার কাজ হবে। যেমন—ম⁀। মা-এর উপর ঝট্কার চিহ্ন আছে সুতরাং পমগমা গাইতে হবে ঐ একমাত্রার মধ্যে। ঝট্কার নিয়ম—যে স্বরের উপর ঐ চিহ্ন থাকে, প্রথমে তার পরের স্বর, তারপর ঝট্কা-চিহ্নিত স্বর, তারপর তার আগের স্বর ও আবার ঝট্কা চিহ্নিত স্বর গাইতে হবে।

৯। প্রতি তাল বিভাগের পর '।' ছেদ চিহ্ন বসে এবং তালের ফের পূর্ণ হলে "I" স্তম্ভ চিহ্ন বসে।

১০। আস্থায়ীর শুরুতে যেখান থেকে রীতিমত তাল আরম্ভ হয় সেখানে ও প্রত্যেক কলির শেষে 'II' এইরূপ যুগল স্তম্ভ চিহ্ন বসে, আর যেখানে গান শেষ হয় সেখানে 'II II' এইরূপ দুই জোড়া স্তম্ভ চিহ্ন বসে। আস্থায়ীর শুরুতে যুগল স্তম্ভের বাইরে যে অংশ থাকে সেটুকু কেবল মাত্র গান শুরু করবার সময় গাইতে হয়, তা আর দ্বিতীয় বার গাইতে হয় না।

১১। { }=পুনরাবৃত্তি চিহ্ন।—এই চিহ্ন থাকলে ঐ অংশটুকু দুইবার গাইতে হবে, যেমন—{ সা রা গা মা }—অর্থাৎ এই অংশটি দুইবার গাইতে হবে।

১২। লঙ্ঘন চিহ্ন=( ), পুনরাবৃত্তি কালে এইরূপ চিহ্ন থাকলে এই অংশটুকু বাদ দিয়ে গাইতে হবে, যেমন—{ সা রা (গা মা) পা ধা } এই অংশটি গাইবার সময় প্রথমে সা রা গা মা পা ধা গেয়ে দ্বিতীয় বার 'সা রা'-র পর (গা মা) বাদ দিয়ে 'পা ধা' অংশ গাইতে হবে।

১৩। কোন একটি স্বর আর এক স্বরে বিশেষভাবে যখন গড়িয়ে যায় তখন স্বরের নীচে এইরূপ "‿" চিহ্ন বসে, যেমন—'সা পা'। একে 'মিড়' বলে।

১৪। বিরাম চিহ্ন হাইফেন-(—) বর্জিত আকার, যেমন—া া া, যেখানে হাইফেন-বর্জিত আকার থাকবে সেখানে ঐ কয় মাত্রা থেমে আবার তার পরবর্তী স্বর অনুসারে গাইতে হবে।

১৫। আস্থায়ীর যে পর্যন্ত গাইবার পর অপর কলি শুরু করতে হয়, সেখানে নির্ধারিত স্থানের উপর " ॥ " যুগল দাড়ি চিহ্ন দেওয়া থাকে। যেমন—রা গা মা ॥ পা অর্থাৎ এই পা পর্যন্ত গেয়ে অপর কলি শুরু করতে হবে।

১৬। গানের আস্থায়ী গেয়ে অন্তরা গেয়ে আবার আস্থায়ীতে ফিরে যেতে হয় কিন্তু সঞ্চারী গাইবার পর আস্থায়ীতে না গিয়ে আভোগ শেষ করে পরে আস্থায়ীতে ফিরে যাওয়া নিয়ম। সেইজন্য সঞ্চারীর শেষে কোন স্তম্ভ চিহ্ন বসে না—একেবারে আভোগের শেষে "II II" এইরূপ দুইজোড়া স্তম্ভ চিহ্ন বসে।

হিন্দুস্থানী স্বরলিপি-পদ্ধতি

১। সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি—এই সাতটি স্বর নিয়ে একটি সপ্তক গঠিত হয়েছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে তিনটি সপ্তক ব্যবহৃত হয়, যেমন—উদারা (নিম্ন), মুদারা (মধ্য) ও তারা (উচ্চ)।

উদারার চিহ্ন—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি।

মুদারার চিহ্ন—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি।

তারার চিহ্ন— সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি।

২। উপরে যে স্বরগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি শুদ্ধ স্বর আর এর মধ্যে ৪টি কোমল ও ১টি তীব্র স্বর আছে।

৩। শুদ্ধ, কোমল ও তীব্র স্বরের চিহ্ন—

শুদ্ধ	কোমল	তীব্র
রে	রে	—

শুদ্ধ	কোমল	তীব্র
গ	গ -	—
ধ	ধ -	—
নি	নি -	—
ম	—	। ম

৪। প্রত্যেক তালের ভাগের পর ' | ' ছেদ চিহ্ন বসে, যেমন—

(ক) প প ধ নি | র্সা র্সা ধ প | অর্থাৎ এক একটি ভাগে ৪টি করে মাত্রা আছে এবং সব কয়টি স্বরে সমান মাত্রা বিদ্যমান আছে।

(খ) এক মাত্রায় দুই স্বর ব্যবহৃত হলে 'গম' এইরূপ চিহ্ন বসে। এক মাত্রায় তিন স্বর ব্যবহৃত হলে 'মপধ' এইরূপ চিহ্ন বসে।

৫। এক স্বর থেকে অপর স্বরে যাবার সময় যদি কোন স্বরকে স্পর্শ করে যায়, তাকে 'কন্' বলে। স্পর্শ স্বরটি প্রধান স্বরের উপরে ছোট করে লেখা থাকে, যেমন—সাগ। অর্থাৎ গ স্বরে যাবার সময় সা স্বরটি স্পর্শ করে গেছে বুঝতে হবে।

৬। একটি স্বর থেকে অপর স্বরে বিশেষভাবে গড়িয়ে যাওয়াকে 'মিড়' বলে। মিড় চিহ্ন 'মরে' এই রূপ বসে। অর্থাৎ ম স্বর থেকে রে স্বরে বিশেষ ভাবে গড়িয়ে যেতে হবে।

৭। স্বরলিপির নীচে যে বাণী লিপিবদ্ধ করা হয় তাতে কোন অক্ষরের অকার, আকার, ইকার, উকারের রেশ যে কয়মাত্রা টানতে হয়, সেখানে 's' এই রূপ চিহ্ন বসে, যেমন— ম ম প অর্থাৎ রাম শব্দটির 'রা' এর আকার

রা s ম

পরের মাত্রায় পড়েছে বুঝতে হবে।

৮। যেখানে একই স্বর দুই বা ততোধিক মাত্রায় উচ্চারিত হয় অথচ সেই স্বরের নীচে কোন অক্ষর নেই, কেবল শব্দের শেষে অকার, আকার, ইকার ও উকার ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে সেই স্বরের পর '—' এইরূপ চিহ্ন বসে, যেমন— | র্সা — ধ নি | ইত্যাদি।

| পী s ব ত |

৯। কোন স্বরে (প) এইরূপ চিহ্ন থাকলে সেখানে যে স্বরের উপর ঐ

চিহ্ন বসে প্রথমে তার পরের স্বর তারপর সেই স্বর ও তারপর তার পূর্বের স্বর আবার সেই স্বর গাইতে হয়। যেমন—এখানে (প) স্বরে ঐ রূপ চিহ্ন থাকায় গাইতে হবে ধপমপ। যদি (ম) স্বরে এইরূপ চিহ্ন থাকে তাহলে গাইতে হবে পমগম।

১০। সম চিহ্ন = †
ফাঁক চিহ্ন = ০

উদাহরণ-স্বরূপ তাল ভাগ করে চিহ্নসহ নীচে একটি গীতাংশ লিপিবদ্ধ করা হল। যেমন—

রাগ বিলাওল—তাল ত্রিতাল

পগ প নি ধনি | সা — সা সা | নিসা রে সা নি | ধ প মগ মরর
তু ১ হি আ | ধা ১ র স | ক ল ত্রি ভু | ব ন কোঁ১ ১১
৩ × ২ ০

বিভিন্ন তালের ঠেকা

দাদ্‌রা—৬ মাত্রা

১। ঠেকা
† ০
ধি ধিন্ না | না তিন্ না |

কাহারবা—৮ মাত্রা

২। ঠেকা
† ০
ধা গে তে টে | না গ ধি ন |

ত্রিতাল—১৬ মাত্রা

৩। ঠেকা
† ৩ ০
ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা | না তিন্ তিন্ তা |
১
তেটে ধিন্ ধিন্ ধা |

চৌতাল—১২ মাত্রা

৪। ঠেকা † ০ ২ ০ ৩
ধা ধা । ধিন্ তা । কৎ তাগে । ধিন্ তা । তেটে কেটে
৪
গদি ঘেনে ।

ঝাঁপতাল—১০ মাত্রা

৫। ঠেকা † ৩ ০ ১
ধি না । ধি ধি না । তি না । তি তি না ।

তেওরা—৭ মাত্রা

৬। ঠেকা † ২ ৩
ধিন্ ধিন্ না । তেটে কেটে । গদি ঘেনে

সুরফাঁক তাল—১০ মাত্রা

৭। † ০ ২ ৩ ০
ধা ধা । দীন্ তা । কিট্ ধা । তিট কত । গদি ঘন

একতাল (দ্রুত)—১২ মাত্রা

৮। † ০ ২ ০ ৩ ৪
ধিন্ ধিন্ । ধা ধা । তুন্ না । কৎ তা । ধা তূক্ । ধিন্ না

একতাল—১২ মাত্রা

৮। ঠেকা ০ ১ †
কৎ তা ধাগে । (ত্রেকট ধিন্ নাগে । ধা ধিন্ না ।

না তিন্ না ।

রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল

ষষ্ঠী তাল—৬ মাত্রা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
†
১। ঠেকা— ধা গে | ধা গে তে টে |

ঝম্পক—৫ মাত্রা

১ ২ ৩ ৪ ৫
† ২
২। ঠেকা— ধি ধি না | ধি না |

নবতাল—৯ মাত্রা

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৬ ৭ ৮ ৯
৩। ঠেকা—ধা দেন্ তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে | ধাগে তেটে |
× ২ ৩ ৪

একাদশী—১১ মাত্রা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
† ২ ৩ ৪
৪। ঠেকা—ধা দেন্ তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে | ধাগে তেটে তাগে তেটে |

রূপকড়া—৮ মাত্রা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
† ২ ৩
৫। ঠেকা—ধি ধি না | ধি না | তি তি না |

কীর্তনে ব্যবহৃত কয়েকটি তাল

১। লোফা তাল—৬ মাত্রা

(গুরু) ঝা ক ঝা ঝা ঘি নি ॥
×
(লঘু) তা ক তা তা ধি টি
× •

২। ছোট লোফা—৬ মাত্রা

ধি ইন্ তা — ধি ধা ॥
× ০

৩। ছোট দশকোশী তাল—৭ মাত্রা

(গুরু) ঝাঁ - - ঝি নাক ঝিনি ঝাঁ - - ঝি নাক ঝিনি
× ০ ২ ০

ঝাঁ-গুরু গুরু জাঘি নাক তিনি তিনি ॥
৩ ৪ ০

(লঘু) তা - - থি নাক থিনি তা - - থি নাক থিনি
× ০ ২ ০

তা গুরু গুরু তাৎ - তা খিখি ॥
। ৪ ০

৪। তেওট তাল—১৪ মাত্রা

(গুরু) ঝাঁ থি ঝাঁ থি — গুরু গুরু গুরু গুরু
× ০ ০

ঝাঁ থি ঝিন্ নাক্ দিগি দাঘি নেতা খেটা ॥
২ ০ ৩ ০

(লঘু) তা — তা — — গুরু গুরু গুরু গুরু
× ০ ০

তাৎ তেটে তেটে খিটি নাক দাধে ইদা ধেই ॥
২ ০ ৩ ০

৫। দাসপ্যারী তাল—৮ মাত্রা

ঝিনি তা তেটে তা থি - গুরু গুরু দাঘি নেদা গেদা ॥
× ২

৬। ছোট দাসপ্যারী—৪ মাত্রা

দাঘি নেতা নাক দিঘা ॥
× ২